# কুরআন-হাদীসের পঁয়ত্রিশটি ভবিষ্যদ্বাণী

খন্দকার শাহ্‌রিয়ার সুলতান



এই সেই ফেরাউন যে নিজেকে প্রভু দাবি করেছিল এবং হযরত মূসা (আঃ) এর সাথে সংঘাতে পানিতে ডুবে প্রাণ হারিয়েছিল

আকাবা প্রকাশনী

কুরআন-হাদীসের

# পঁয়ত্রিশটি ভবিষ্যদ্বাণী

খন্দকার শাহরিয়ার সুলতান

(প্রথম খন্ড)

আকাবা প্রকাশনী

কুরআন হাদীসের পঁয়ত্রিশটি ভবিষ্যদ্বাণী
খন্দকার শাহরিয়ার সুলতান

**প্রথম প্রকাশ :**
ডিসেম্বর, ২০০৪

**প্রকাশক :**
**আকাবা প্রকাশনী**
৭৪৪ মনিপুর, মীরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল ঃ ০১৭২-৫৯৭৯৫৫


প্রচ্ছদে ফেরাউনের ছবি : সৌজন্যে-শাহেদ ফেরদৌস

**মূল্য :** ৬৫.০০ টাকা

**পরিবেশক :**

১। ভূঁইয়া প্রকাশনী, ৩৮/৩, বাংলাবাজার (কম্পিউটার মার্কেট), ঢাকা।
২। কাঁটাবন বুক কর্নার, কাঁটাবন মসজিদ গেট, শাহবাগ, ঢাকা।
৩। আলীগড় লাইব্রেরী, সাহেব বাজার, রাজশাহী
৪। তাকওয়া পাবলিকেশনস্, ৩৯, সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর-১০, ঢাকা।
৫। আধুনিক লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম কলেজ রোড, চট্টগ্রাম।

উৎসর্গ

মাতামহী ও মাতাপিতার স্মরণে

# অভিমত

আলকুরআন পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। কুরআন ও হাদীস অফুরন্ত ঐশী জ্ঞানের ভান্ডার। কুরআন ও হাদীস থেকে বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বাণী চয়ন করে লেখক এ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণ সহকারে ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে উপস্থাপন করায় বইখানি সুখপাঠ্য হয়েছে এবং গ্রহণযোগ্যতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রচ্ছদে ফেরাউনের মমির ছবি বইটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। উল্লেখ্য গায়েব বা ভবিষ্যতের খবর একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। নবী-রাসূলগণ যে সব গায়েবের কথা বলেছেন তা মহান আল্লাহর প্রত্যাদেশ অনুসারেই বলেছেন। নিজে থেকে তারা কোন কিছু বলতেন না।

বইখানি পড়লে লেখকের আন্তরিক প্রচেষ্টার ছাপ পাওয়া যায়। আশা করি বইটি সাধারণ পাঠকবৃন্দকে ইসলামী ঐতিহ্য ও নিদর্শনের প্রতি আরও আকৃষ্ট করবে এবং আত্মবিস্মৃত মুসলিম জাতিকে জাগ্রত করতে সাহায্য করবে।

**ডঃ মুহাম্মাদ জামাল উদ্দিন**
অধ্যাপক, আইন বিভাগ
উত্তরা ইউনিভার্সিটি, উত্তরা, ঢাকা।

# উপক্রমণিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য এবং দরূদ ও সালাম মানবতার একমাত্র আদর্শ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি।

আল কুরআন বর্তমান পৃথিবীতে একমাত্র ঐশী জ্ঞানের ভাণ্ডার যা পৃথিবীর কোন মানুষের রচিত নয়। অনুরূপভাবে আল হাদীসও তাই। মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের দিক নির্দেশনা কুরআন ও হাদীসে রয়েছে। অজস্র তত্ত্ব-তথ্যে ভরপুর কুরআন ও হাদীসে বহু ভবিষ্যদ্বাণীও রয়েছে। এগুলোর মধ্য থেকে ৩৫টি ভবিষ্যদ্বাণীর উপর এ পুস্তকে আলোচনা করা হয়েছে। এ পঁয়ত্রিশটি ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে ১৬টি ভবিষ্যদ্বাণী অনেক আগেই সত্যে পরিণত হয়ে গেছে। যেমন– তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যকে পরাজিত করে তাদের সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত করার ভবিষ্যদ্বাণী, খেলাফতের মেয়াদ ৩০ বছর, সাহাবীদের যুগ ১০০ বছর টিকে থাকার ভবিষ্যদ্বাণী। ১১টি ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়ে এখনো সত্য হিসেবে বর্তমান রয়েছে। যেমন– ফেরাউনের মৃতদেহ ও নূহ (আঃ) এর নৌকা সংরক্ষিত থাকা এবং ইহুদীদের চিরদিন লাঞ্ছিত ও অপমানিত থাকার ভবিষ্যদ্বাণী। অবশিষ্ট ৮টি ভবিষ্যদ্বাণী এখনো সংঘটিত হয়নি। ভবিষ্যতে অবশ্যই সত্য হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। যেমন- ইসলাম ও মুসলমানদের পুনরায় বিশ্বব্যাপী বিজয়ী হওয়া এবং ভারতবর্ষের (হিন্দুস্থানের) যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদি।

প্রথম খণ্ডে ৩৫টি ভবিষ্যদ্বাণীর উপর আলোচনা করা হলেও এরূপ আরও অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। সেগুলো থেকে পরবর্তী খণ্ডে আলোচনা করার আশা রাখি।

এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ব্যক্ত করা হয়েছিল ৬১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোটামুটি ২২ বছর সময়কালের মধ্যে। আর এগুলো সত্যে পরিণত হয়েছে কোন কোনটি ১০ বছরের মধ্যে, কয়েকটি ৪০/৫০ বছরে কোনটি ১০০ বছরে এবং কয়েকটি পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে।

ভবিষ্যদ্বাণীর উপর লেখা এ প্রবন্ধগুলো ২০০৪ ইসায়ী সালের শুরু থেকে দৈনিক সংগ্রামের 'ইসলাম ও জীবন' পাতায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থের শেষাংশে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের উদ্দেশ্যে কুরআন ও হাদীসের উদ্বৃতির মাধ্যমে কিছু হৃদয় গলানো নসীহত করা হয়েছে।

সম্মানিত পাঠকদের সুবিধার্থে প্রত্যেকটি ভবিষ্যদ্বাণীর তথ্যসূত্র বা উৎস (কুরআনের সূরা, আয়াত নম্বর বা হাদীস গ্রন্থের নাম) উল্লেখ করা হয়েছে এবং মূল পাঠের **(Text)** অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে।

কুরআন ও সহীহ হাদীস গ্রন্থাবলী ছাড়াও যে সকল সম্মানিত লেখকদের গ্রন্থ থেকে সহায়তা নিয়েছি তাঁদের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেনঃ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রঃ) (গ্রন্থ তাফহীমুল কুরআন, সিরাতে সরওয়ারে আলম, খেলাফত ও রাজতন্ত্র ইত্যাদি) এবং মাওলানা মুফতি শফি (রঃ) (গ্রন্থ মারেফুল কুরআন)। এছাড়া আরো অনেকের নাম এ অল্প পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব হল না।

আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিছু ভুল ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হলে তা সংশোধনের উদ্দেশ্যে জানানোর জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এছাড়া যে কোন পরামর্শ, মন্তব্য ও গঠনমূলক সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হবে।

পাণ্ডুলিপি রচনা ও প্রুফ রিডিং-এ সহযোগিতার জন্য মিজান, শাকিল, তৃষা, নাদিয়া, প্রভা, সৌমি, তাপসী, আনিকাকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই আমার স্ত্রী হোসনে আরা শামীমকে তাঁর আন্তরিক উৎসাহ ও সহযোগিতার জন্য।

আমার লেখালেখির জন্য যাঁর কাছে আমি সবচেয়ে বেশি ঋণী তিনি হলেন বিশিষ্ট গবেষক লেখক ও প্রাবন্ধিক ডঃ মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, সহকারী অধ্যাপক, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, উত্তরা, ঢাকা। তিনি আমার প্রবন্ধগুলো সম্পাদন করেছেন।

দয়াময় আল্লাহ্ তাআলার নিকট একান্ত প্রার্থনা, তিনি যেন বান্দার এই দ্বীনী খেদমতটুকু কবুল করে নেন। আমিন।

বিনীত
খন্দকার শাহ্‌রিয়ার সুলতান

# সূচিপত্র

# কুরআন হাদীসের পঁয়ত্রিশটি ভবিষ্যদ্বাণী

ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল সহজাত। ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা জানতে কেনা আগ্রহী। এ জন্য ভবিষ্যদ্বক্তা, গণক বা জ্যোতিষীদের এত কদর। অথচ এরা ভবিষ্যতের বিষয় সম্পর্কে মোটেও অবহিত নয়। এরা জ্ঞান বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করে তা কখনো কখনো সত্য হয়। প্রখ্যাত মার্কিন জ্যোতিষী জীন ডিক্সন এবং উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাধক শাহ নিয়ামত উল্লাহ এর অনেক ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে। তবে কোন জ্যোতিষী শতকরা একশ ভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন না এবং করতে পারে বলে দাবিও করেন না।

আসল কথা হল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বা অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ কিছু জানে না। তবে আল্লাহ তায়ালা যদি কাউকে কিছু জানিয়ে দেন সেটা অন্য কথা। নবী রাসূলগণ যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তা আল্লাহ তাআলার প্রত্যাদেশক্রমেই করেছেন। তাঁরা নিজ থেকে কোন কিছু বলেন নি। এজন্য তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী কখনো মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়নি। নিছক ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করেন নি। কথা প্রসঙ্গে বা বিশেষ কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা এ ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ব্যক্ত করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, জ্যোতিষী বা গণকদের ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করা হারাম ও কুফরী।

কুরআন ও হাদীস হল মানবজাতির Guide Book. মানব জীবনের এমন কোন সমস্যা নেই যার সমাধানের দিক নির্দেশনা কুরআন ও হাদীসে দেওয়া হয়নি। অজস্র তত্ত্বে ও তথ্যে ভরা কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ এবং রাসূল (সাঃ) এর অনেক বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণীও রয়েছে। এসব ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে, এখনো হচ্ছে এবং হতে থাকবে। এগুলোর একটিও কখনো ভুল প্রমাণিত হয়নি।

এখানে কুরআন ও হাদীস থেকে ৩৫টি ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে ১৬টি ভবিষ্যদ্বাণী অনেক আগেই সত্য প্রমাণিত হয়ে গেছে। ১১টি ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হিসেবে এখনও বর্তমান রয়েছে। অবশিষ্ট ৮টি ভবিষ্যদ্বাণী এখনও সংঘটিত হয়নি। ভবিষ্যতে অবশ্যই সত্য প্রমাণিত হবে এতে সন্দেহ নেই।

এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ব্যক্ত করা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশ' বছর পূর্বে ৬১০ থেকে ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ মোটামুটি ২২ বছরের মধ্যে। এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে ১০ বছরের মধ্যে, কোন কোনটি ৩০-৪০ বছরের মধ্যে, কোনটি ১০০ বছরে, কোন কোনটি পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে। যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সত্য হিসেবে এখনও বর্তমান রয়েছে সেগুলো বড়ই বিস্ময়কর। যে ৮টি ভবিষ্যদ্বাণী এখনও কার্যকর হয়নি ভবিষ্যতে কত দিনে তা কার্যকরী হবে বলা সম্ভব নয়। হতে পারে খুব শীঘ্রই অথবা অনেক দেরীতে।

কতগুলো ভবিষ্যদ্বাণী দুনিয়ার জীবনের শেষ দিকে অর্থাৎ কিয়ামতের প্রাককালে সংঘটিত হবে। কিয়ামতের ১২০ দিন পূর্বে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে বলে হাদীসে বর্ণিত আছে।

# ভবিষ্যদ্বাণী - এক
## ফেরাউনের মৃতদেহ সংরক্ষিত থাকবে

আল কুরআনের সুরা ইউনুসের ৯০-৯২ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আমি বনি ইসরাইলদিগকে সমুদ্র পার করলাম এবং ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী যারা বিদ্বেষ পরবশ হয়ে সীমা লংঘন করেছিল তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে । পরিশেষে যখন সে নিমজ্জিত হল তখন বললো, আমি ঈমান আনলাম, কোন ইলাহ নেই সেই আল্লাহ ছাড়া যে আল্লাহর উপর বনি ইসরাঈলগণ বিশ্বাসী এবং আমি মুসলিমদের অন্ত র্ভুক্ত। (আল্লাহ উত্তর দিলেন) এখন! পূর্বে তো তুমি ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে; আজ আমরা কেবল তোমার (মৃত) দেহকে রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পার।"

এটি আল কুরআনে বর্ণিত একটি বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বাণী এবং অত্যাশ্চর্য ঘটনা।

খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়কাল। আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে হযরত মূসা (আঃ) এর সাথে যে ফারাও সম্রাট বা ফেরাউনের সংঘাত হয় তার নাম পবিত্র কুরআনে দেওয়া হয়নি।

পবিত্র কুরআনে 'ফেরাউন' নামটি অসংখ্যবার এসেছে। 'ফেরাউন' কোন একজন ব্যক্তির নাম নয়। এটি একটি রাজবংশের (Dynasty) নাম। ফেরাউনরা ছিল তৎকালীন মিশরের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী শাসকগোষ্ঠী। এরা মিশরীয় সভ্যতা বিনির্মাণে অনেক অবদান রাখে।

মিশরতত্ত্ববিদ ও গবেষকগণ স্থির করেছেন যে, হযরত মূসা (আঃ) এর সময়কালের ফেরাউনের নাম ছিল 'মারনেপতাহ'। মূসা (আঃ) ও তাঁর অনুসারীদের পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে যিনি সৈন্যবাহিনীসহ সাগরে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ হারান। এই ফেরাউন এতই প্রতাপশালী ও ক্ষমতাদর্পী ছিল যে, সে নিজেকে প্রভু হিসেবে ঘোষণা করে এবং জনগণকে তা মানতে বাধ্য করত। পবিত্র কুরআনে ফেরাউনের কথাকে এভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে, "আনা রব্বুকুমুল আলা"–"আমি তোমাদের বড় প্রভু।" (সূরা ত্ব-হা, আয়াত ঃ ২৪)

আল কুরআনের নানা স্থানে ফেরাউনের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। ফেরাউন তার ক্ষমতাকে নিরংকুশ করার জন্য বিরোধী বনি ইসরাঈলী পুরুষদেরকে নির্বিচারে হত্যা করতো এবং নারীদেরকে জীবিত রেখে দাসী বানাতো। তার বাড়াবাড়ি যখন সীমা লংঘন করল তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ) কে তার কাছে পাঠালেন। "ইযহাব ইলা ফিরআউনা ইন্নাহু ত্বগা" অর্থাৎ "ফেরাউনের কাছে যাও সে অত্যন্ত বেড়ে গেছে।"

সবাই জানি, এই ফেরাউনের প্রাসাদেই শিশু মূসা (আঃ) লালিত পালিত হন। গণকদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ফেরাউন যখন নির্মমভাবে শিশুদেরকে হত্যা করতে লাগলো তখন শিশু মূসা (আঃ) কে তাঁর মা আল্লাহর আদেশে একটি কাঠের বাক্সে করে সাগরে ভাসিয়ে দেন। ভাসতে ভাসতে এসে শিশু মূসা (আঃ) ফেরাউনের প্রাসাদেই আশ্রয় লাভ করেন। পরবর্তীকালে হযরত মূসা (আঃ) যখন ফেরাউনের বিরুদ্ধাচরণ করেন তখন ক্ষিপ্ত হয়ে ফেরাউন তাঁকে হত্যার আদেশ দেন। হযরত মূসা (আঃ) মিশর থেকে পালিয়ে গিয়ে মাদায়েন শহরে হযরত শুয়াইব (আঃ) এর নিকট আশ্রয় নেন। উল্লেখ্য ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া ছিলেন হযরত মূসা (আঃ) এর অনুসারী এবং অত্যন্ত পূণ্যবতী মহিলা। হাদীসে এসেছে, পূর্ণতাপ্রাপ্ত চারজন শ্রেষ্ঠ নারীর মধ্যে একজন হলেন হযরত আসিয়া।

আল-কুরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণী সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে হিযরতের বছর চারেক পূর্বে। তখন ফেরাউনদের মৃতদেহগুলো শায়িত ছিল মিশরের রাজধানী কায়রো থেকে ৭/৮ কিলোমিটার দক্ষিণে নীল নদের পাড়ে অবস্থিত থিবিসের সমাধিক্ষেত্রে। তখনকার দিনে এসব মৃতদেহ সম্পর্কে আরবাসীদের তো দূরের কথা বিশ্বের কারো কিছু জানা ছিল না। জানা সম্ভবও ছিল না।

ফেরাউনের মৃতদেহের মমি আবিস্কৃত হয় ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে। সৈন্যবাহিনীর অন্যান্যদের মতই ফেরাউনের লাশও সমুদ্রের গর্ভে হারিয়ে বিনষ্ট হতে পারতো কিংবা হাঙর-কুমির খেয়ে ফেলতে পারত। সেরকম হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় ফেরাউনের মৃতদেহ উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে রাজকীয় প্রথামতে মমীকৃত হবার সুযোগ পেয়েছিল এবং পরবর্তীকালের জন্য নির্দশন হিসাবে সংরক্ষিত হবার সুযোগ পেয়েছিল।

ফ্রান্সের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. মরিস বুকাইলী তাঁর সাড়া জাগানো "The Bible The Quran and The Science." গ্রন্থে লিখেছেন, "১৯৭৫ সালের জুন মাসে মিসরীয় কর্তৃপক্ষ অনুগ্রহ করে আমাকে (ড. বুকাইলীকে) মমিটির শরীরের বিভিন্ন অংশের পরীক্ষা করে দেখার অনুমতি দেন। মমিটির শরীরের বিভিন্ন অংশের ছবি তোলারও অনুমতি দিয়েছিলেন। এতদিন যাবৎ মমিটির শরীরের এসব অংশ কাপড়েই ঢাকা পড়ে ছিল।

আমার পরামর্শক্রমে ১৯৭৫ সালের জুন মাসে মমিটিকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য একটি বিশেষ টীম গঠন করা হয়। ড. এল মিলিগাই এবং ড. র‍্যামসিয়াস এর দ্বারা মমিটির উপরে চমৎকারভাবে রেডিওগ্রাফী স্টাডি পরিচালিত হয়। দেখা গেছে মমিটির হাড়ে একাধিক ক্ষত বিদ্যমান। সেগুলিতে ফাঁকও রয়েছে বড় বড়। পরীক্ষা করে আরও যা পাওয়া গেছে তাতে বলা যেতে পারে যে, এই ফেরাউনের মৃত্যু ঘটেছে ধর্মগ্রন্থে যেমনটি বলা হয়েছে-পানিতে ডুবে যাওয়ার কারণে বা ডুবে যাওয়ার প্রাক্কালে নিদারুণ কোন শকের কারণে।

ইতিহাসের নির্দশনাবলীর সংরক্ষণ সবারই কাম্য। কিন্তু এখানে যে মমিটির সংরক্ষণের কথা বলা হচ্ছে তা শুধু নিছক কোন ঐতিহাসিক নির্দশন নয়; এ মমিটির

গুরুত্ব তার চেয়েও অনেক বেশি। এটি এমন একজন মানুষের মৃতদেহ যার সাথে হযরত মূসা (আঃ) এর পরিচয় হয়েছিল, যে মানুষটি হযরত মূসার দ্বীন প্রচার প্রতিহত করতে চেয়েছিল এবং হযরত মূসা (আঃ) যখন বনী ইসরাঈলদেরকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন এই লোকটিই তাদের পিছু ধাওয়া করেছিল। আর পিছু ধাওয়া করতে গিয়েই মারা পড়েছিল সমুদ্রের পানিতে ডুবে। আল্লাহর ইচ্ছায় তার মৃতদেহ ধ্বংস হবার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং কুরআনের বাণী অনুসারে ভবিষ্যৎ মানব জাতির জন্য তা নির্দশন হিসাবে সংরক্ষিত রয়ে গেছে।

এ যুগে অনেকেই আধুনিক তথ্য প্রমাণের আলোকে ধর্মীয় গ্রন্থের বিভিন্ন বর্ণনার সত্যাসত্য যাচাই করে নিতে চান। তাঁদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন মিশরে গিয়ে মিশরীয় যাদুঘরের রয়্যাল মমিজ কক্ষে সংরক্ষিত এই মমিটি দেখে আসেন। তাহলেই বুঝতে পারবেন কুরআনের আয়াতে ফেরাউনের মৃতদেহ সংরক্ষণ সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে– তার বাস্তব উদাহরণ কত জাজ্জ্বল্যমান।

# ভবিষ্যদ্বাণী - দুই
## ইসলামী খেলাফতের মেয়াদ হবে ৩০ বছর

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমার উম্মাতের খেলাফতের মেয়াদ হবে ৩০ বছর। তারপর শুরু হবে রাজতন্ত্র। (তিরমিযী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ২১৭৩ নং হাদীস, বাংলাদেশ ইসলামি সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ইনতেকালের পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী খেলাফত পরিচালনা করেন খুলাফায়ে রাশেদীন। খুলাফায়ে রাশেদীন হলেন সত্য পথ প্রাপ্ত চারজন শ্রেষ্ঠ সাহাবী হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)। এই চারজন খলিফার খেলাফতের মেয়াদকালের যোগফল দাঁড়ায় ২৯ বছর ৬ মাস। হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) ৬ মাস খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। ছয় মাস পর তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর অনুকূলে খেলাফতের দায়িত্ব ত্যাগ করেন। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর শাসনামল থেকে ইসলামী খেলাফতের স্থলে রাজতন্ত্রের সূচনা হয়। এ ব্যাপারে উম্মাতে মুহাম্মদীর আলেম সমাজ একমত। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীস অনুযায়ী ইসলামী খেলাফতের মেয়াদ ছিল পুরোপুরি ৩০ বছর। আর পৃথক ভাবে খলিফাদের খিলাফতের মেয়াদকাল ছিল এরূপঃ হযরত আবুবকর (রা:)- ২ বছর ২ মাস ( ৬৩২-৬৩৪ খ্রি:)।

হযরত ওমার (রা:)- ১০ বছর (৬৩৪-৬৪৪খ্রি:), হযরত উসমান (রা:) - ১২ বছর (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি:), হযরত আলী (রা:) ও হযরত হাসান (রা:)-৬ বছর (৬৫৬-৬৬১ খ্রি:)।

# ভবিষ্যদ্বাণী - তিন

## আজ থেকে একশত বছর পর এখনকার কেউ জীবিত থাকবে না

হাদীস ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর জীবনের শেষ দিকে আমাদের নিয়ে এশার নামায আদায় করেন। সালাম ফিরানোর পর ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, তোমরা কি লক্ষ্য করেছ আজকের এই রাতের প্রতি? যারা এখন জীবিত আছে তারা একশত বছর পর পৃথিবীর বুকে জীবিত থাকবে না। (তিরমিযী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ২১৯৭ নং হাদীস, বাংলাদেশ ইসলামি সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর ইনতেকালের মাত্র একমাস পূর্বে উপরোক্ত কথা বলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী ঠিক একশত বছরের মাথায় তার সাহাবীগণের মধ্যে কেউ জীবিত ছিলেন না। ১১০ হিজরীতে তার সর্বশেষ সাহাবী আবুত তুফাইল আমের ইবনে ওয়াসিলা ইনতেকাল করেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়।

# ভবিষ্যদ্বাণী - চার

## রোম পারস্যের উপর বিজয়ী হবে

আল কুরআনের তিরিশ নম্বর সূরার নাম 'রোম' (আরবী উচ্চারণ রূম)। রোম সাম্রাজ্য এবং পারস্য সাম্রাজ্য ছিল তৎকালীন বিশ্বের দুটি বৃহৎ পরাশক্তি। এই রোম নামটি সূরা রূমের মধ্যে রয়েছে। সূরা রূমের প্রাথমিক আয়াতগুলোতে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা আল কুরআন আল্লাহ তাআলার বাণী হওয়ার এবং মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) আল্লাহর সত্য নবী হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণগুলোর অন্যতম। এ আয়াতগুলোতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে কয়েক বছরের মধ্যেই পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রোম বিজয়ী হবে।

এ কথার মধ্যে দু'টি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। এক-রোমীয়গণ বিজয় লাভ করবে। দুই-মুসলমানদেরও সে সময় বিজয় সূচিত হবে। দৃশ্যত ঃ এ দুটি ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়ার কোন লক্ষণই তখন দেখা যাচ্ছিল না। একদিকে ছিল মুষ্টিমেয় মুসলমান যারা মক্কায় নিষ্পেষিত-নির্যাতিত হচ্ছিল। অপরদিকে রোমীয়দের পরাজয় দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল। কারণ তৎকালীন সময়ে পারস্য সাম্রাজ্য ছিল রোমান সাম্রাজ্যের চেয়ে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী।

৬১৩ খ্রিস্টাব্দে পারস্য বাহিনী দামেস্ক জয় করে। পরের বছর তারা জেরুজালেম জয় করে খ্রিস্টানদের উপর ধ্বংসলীলা শুরু করে। এ শহরের নব্বই হাজার খ্রিস্টানকে তারা হত্যা করে। একের পর এক বিজয় পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজকে কতখানি মদমত্ত করেছিল তার স্বাক্ষর পাওয়া যায় তার লেখা পত্রে যা তিনি জেরুজালেম জয় করার পর রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াসের (কায়সার) কাছে পাঠান। তাতে তিনি লেখেনঃ

"সকল খোদার বড় খোদা, সারা জাহানের মালিক খসরুর পক্ষ থেকে ঐ হীন এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন বান্দা হেরাক্লিয়াসের প্রতি। তুই বলিস যে, তোর খোদার উপর তোর ভরসা আছে। তাহলে কেন তোর খোদা জেরুজালেমকে আমার হাত থেকে রক্ষা করল না?"

সে সময় রোমের উপর পারস্যের বিজয়ের চর্চা সবার মুখে মুখে শুনা যেতো। মক্কার মুশরিকরা আনন্দে নাচতো এবং মুসলমানদেরকে বলতো, "দেখ, পারস্যের অগ্নিপূজারীরা জয়লাভ করছে এবং অহী ও রিসালাতে বিশ্বাসী রোমানরা পরাজিত হচ্ছে। এমনিভাবে আমরা আরবের প্রতিমা পূজারীরাও তোমাদের দ্বীনকে নির্মূল করে দিব।" ঐতিহাসিকদের ভাষায় কুরআন মজীদের এই ভবিষ্যদ্বাণীর পর সাত-আট বছর পর্যন্ত এমন অবস্থা বিরাজ করছিল যে, কেউ এ ধারণাই করতে পারতো না যে, রোমীয়গণ ইরানীদের উপর বিজয়ী হবে। (* Gilbon – Decline and Fall of the Roman Empire, Vol- 11, Page – 788, Modrn Library, New York)

কুরআনের এ আয়াতগুলো যখন নাজিল হয় তখন মক্কার কাফেররা এ নিয়ে খুব বিদ্রূপ-উপহাস করতে থাকে। হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন আয়াতগুলোতে বর্ণিত ভবিষ্যতদ্বাণীর কথা জানতে পারলেন তখন তিনি তা মক্কার কুরাইশ কাফেরদের কাছে ঘোষণা করতে লাগলেন। মক্কায় বিশিষ্ট ধনী কুরাইশ নেতা উবাই ইবনে খালফ হযরত আবু বকর( রাঃ) এর সাথে এ বিষয়ে বাজি রেখে বলল, যদি তিন বছরের মধ্যে রোমীয়গণ বিজয়ী হয় তো আমি দশটি উট দিব, অন্যথায় তোমাকে দশটি উট দিতে হবে। এ বাজি রাখার খবর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, দশ বছরের মধ্যে সময়কালের শর্ত কর এবং উটের সংখ্যা বাড়িয়ে একশ কর। হযরত আবু বকর (রাঃ) উবাই এর সাথে দেখা করলেন এবং নতুন করে এ শর্ত স্থিরীকৃত হল যে, দশ বছরের মধ্যে যার কথা মিথ্যা প্রমাণিত হবে তাকে একশত উট দিতে হবে।

৬২২ খ্রিস্টাব্দে নবী করীম (সাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিযরত করেন। ওদিকে একই বছরে রোমান সম্রাট কায়সার পারস্যের উপর আক্রমণ করার ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ৬২৩ খ্রিস্টাব্দে আজারবাইজান দখল করে এবং একের পর এক যুদ্ধে পারসিকদের শক্তি ধূলিসাৎ করে দেয়। আল্লাহর কুদরতের লীলা এই যে, একই বছর বদরের যুদ্ধে প্রথমবারের মত মুসলমানগণও কাফেরদের উপর বিজয় লাভ করে। এই ভাবে সূরা রোমে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকর হয়।

# ভবিষ্যদ্বাণী - পাঁচ
## পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের সম্পদরাশি আল্লাহর পথে ব্যয়িত হবে

হাদীস ঃ হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, (পারস্য সম্রাট) কিসরার (খসরু) পতনের পর আর কোন কিসরা ক্ষমতাসীন হবে না এবং (রোম সম্রাট) কাইজারের পতনের পর আর কোন কাইজার ক্ষমতাসীন হবে না। যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! এই দুই সাম্রাজ্যের সমস্ত ধনভাণ্ডার আল্লাহর পথে ব্যয় করা হবে। (জামি' আত-তিরমিযী)

উক্ত হাদীসের অনুরূপ আরও বেশ কিছু হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তৎকালীন বিশ্বের দুই সুপার পাওয়ার রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যকে পরাজিত করে তাদের ধনভাণ্ডার আল্লাহর পথে ব্যয় করার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ইতিহাস সাক্ষী তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। অথচ তিনি যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তখন তিনি ছিলেন নিতান্ত সহায়সম্বলহীন। ক্ষুধা নিবারণের আহার্য এবং নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থাও তাঁর ছিল না। যে কারণে মুশরিকরা তাঁর এসব কথা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত।

মক্কার কুরাইশদের হাত থেকে রক্ষার জন্য তিনি যখন তাঁর সাথীদের নিয়ে মদীনার চারদিকে খন্দক খুঁড়ছিলেন তখন তিনি ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধেছিলেন।

খন্দক (পরিখা) খুঁড়ার এক পর্যায়ে মাটির অভ্যন্তরে একটি বিরাট পাথর দেখা গেল। পাথরের উপর আঘাত করতেই তিনবার আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হল। মহানবী (সাঃ) বললেন, এই আলোকচ্ছটার মধ্যে আমাকে রোম, পারস্য ও ইয়ামেনের রাজপ্রাসাদগুলো দেখানো হয়েছে এবং অচিরেই আমরা এগুলো হস্তগত করব।

কয়েক দশকের মধ্যেই এসব ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত করে দিয়ে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইসলামকে বিশ্বে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পরবর্তীতে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানগণ বিশ্বের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল।

এটা ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। এর প্রায় ৮ বছর পূর্বে ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সঃ) পারস্য সম্রাট খসরু পারভেযকে ইসলামের আহ্বান জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ৬১০ খ্রিস্টাব্দে নবুয়াতের দায়িত্ব প্রাপ্তির পর দশ বছর তাঁর জন্মস্থান মক্কায় ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যপৃত থাকেন। কিন্তু মক্কার কায়েমী স্বার্থবাদী কুরাইশদের প্রবল বাধা, নির্যাতন ও ষড়যন্ত্রের কারণে তিনি মক্কায় টিকতে পারেননি। ফলে কোমল মনের অধিকারী মদীনাবাসীদের আমন্ত্রণে তিনি মদীনায় হিজরত করেন। মক্কা থেকে ২৭০ মাইল দূরে অবস্থিত মদীনায় গিয়ে তিনি অনেকটা নিরাপদে ইসলামের কাজ করতে থাকেন। মদীনায় তিনি একটি ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান হন।

এদিকে মক্কাবাসীদের ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও ক্ষুদ্র মদীনা রাষ্ট্রকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ফলে বদর, উহুদ ও খন্দক নামে প্রসিদ্ধ তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পরপর তিনটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কুরাইশরা মহানবী (সঃ) এর সাথে একটি সন্ধি চুক্তি করে যা হুদাইবিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত। এই সন্ধির ফলে ইসলামের প্রতি বিরোধিতা আপাতত দূর হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) নির্বিঘ্নে ইসলাম প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন।

হুদাইবিয়া সন্ধির অব্যবহিত পরেই তিনি একদিন সাহাবীদেরকে সমবেত করে বললেন, আমি সমগ্র জগতের জন্য রহমত ও রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। তোমরা হযরত ঈসা (আঃ) এর লোকদের ন্যায় মতভেদ করো না। যাও, আমার তরফ হতে তোমরা সত্যের আহ্বান জানিয়ে দাও। ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত। তিনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সত্যের আহ্বান প্রেরণের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন এবং আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দের নিকট ইসলামের আহ্বানলিপি প্রেরণের ব্যবস্থা করলেন।

তৎকালীন বিশ্বে যে কয়টি রাজশক্তি বিদ্যমান ছিল, তন্মধ্যে ইউরোপের রোমান সাম্রাজ্য, এশিয়ার পারস্য সাম্রাজ্য এবং আফ্রিকার হাবশা সাম্রাজ্যই প্রধান ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই তিন রাষ্ট্রপ্রধানসহ মোট ছয়জনের নিকট একই দিনে ছয়টি পত্রসহ ছয়জন দূত প্রেরণ করেন। আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাঃ) কে দূত হিসাবে পারস্য সম্রাট খসরু পারবেয এর নিকট পাঠান। সম্রাট পারবেযের উপাধি ছিল কিস্‌রা। তিনি অত্যন্ত অহংকারী এবং উদ্ধত স্বভাবের ছিলেন। তার বিশাল সেনাবাহিনী, অপ্রতিরোধ্য শক্তিমত্তা ও শান শওকাতের তুলনা তখন কোথাও ছিলনা। মহাকবি ফেরদৌসী 'শাহানামা' মহাকাব্যে তার শক্তিমত্তা ও জাঁক-জমকতার যে বর্ণনা দিয়েছেন

তা সত্যিই বিস্ময়কর। শাহানামা অনুসরণে ডঃ বেগম জাহান আরা রচিত প্রবন্ধ "সম্রাট খসরুর মৃগয়া গমন ও তাকাদেস সিংহাসন নির্মাণ" থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা হলঃ

"সম্রাট হয়ে খসরু পারবেয এক সময় মৃগয়া যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। রাজ- রাজাদের মৃগয়া যেমন হয়ে থাকে, তার যাত্রাকেও সেভাবে সাজানো হলো- সে এক বিশাল ব্যাপার। সম্রাটের মৃগয়া বলে কথা! সম্রাট স্বয়ং নির্দেশ দিলেন তিন হাজার সুবর্ণসাজধারী ঘোড়া প্রস্তুত করতে। সম্রাটের সঙ্গে এক হাজার একশো ষাটজন অনুগত ও ভক্ত বীর বর্শা হাতে পায়ে হেঁটে গেলেন। আর কিংখাব সজ্জিত ঘোড়ায় চড়ে এক হাজার চল্লিশ জন পুরুষ চললেন সম্রাটের পেছনে। এঁদের সবারই হাতে তরবারি। অশ্বারোহীদের পেছনে গেলো সাতশো শিকারি বাজপাখিধারী ব্যক্তি, খাঁচার মধ্যে সত্তরটি সিংহ ও বাঘ। এদের মৃগয়ার জন্য শিক্ষিত করা হয়েছে। সোনার শিকল দিয়ে ওদের মুখ বাঁধা। সাতশো কুকুরের গলায় সোনার শিকল। শিকারের সময় এরা হরিণের পেছনে ধাওয়া করবে।

এই বিশাল বাহিনীর পেছনে চললো দুই হাজার সঙ্গীতকার। শিকারের সময় তাঁরা বাদ্য বাজানাসহ গাইবেন। এঁদের সবারই বাহন ছিল উট। সঙ্গীতকারদের সকলের মাথায় শোভা পাচিছলো সোনার টুপি।

আর এতোগুলো মানুষের জন্য খাদ্য, তাঁবু, শিবির এবং পশুদের আস্তাবল নিয়ে চললো ছয়শো ভারবাহী উট। দুইশো দাস ধুপধুনা এবং আগরদান নিয়ে চললো সামনের দিকে। তাদের অগে গেল দুইশো অনুগত তরুণ। তাদের হাতে জাফরানের পাত্র এবং ফুলদানি। আর সবার আগে আগে চললো জলপাত্রবাহী সুগন্ধি মৃগনাভি বাহকের দল। এরা গোলাপজলের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছে তরল মৃগনাভি। মৃগয়া দলের যাত্রা পথের সামনে তারা ছিটিয়ে ছিটিয়ে যাচেছ সে সুগন্ধি পানি। সম্রাটের যাত্রাপথ হয়ে উঠেছে ভেজা এবং সুগন্ধ ভারি। দমকা হাওয়া উড়ে এসে যেন সম্রাটের বিরক্তি উৎপাদন না করে। যেন ধুলোবালি না লাগে সম্রাটের গায়ে।

সম্রাটের পেছনে পেছনে চললো তিন হাজার সামন্ত রাজা। লাল, হলুদ, ও বেগুনি রঙের পোশাকে তারা সজ্জিত। সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে বহন করা হলো বড়ো বড়ো সুসজ্জিত সুশোভিত পতাকা। রাজা এগিয়ে চললেন রাজন্যবর্গের পুরোভাগে। মৃগয়া বাহিনীর সাজ-সজ্জা আয়োজন এবং বহর ছিল অতিশয় জাঁকজমকপূর্ণ।

বিবরণ থেকেই বোঝা যায়, সম্রাট খসরুর রাজকীয় আড়ম্বরে যেমন ছিল পরিকল্পনা, তেমনি ছিল শৃঙখলা। যেমন ছিলো সুন্দর রুচিবোধ, তেমনি ছিল লালিতকলার রসবোধ। যেমন ছিল সম্রাট সুলভ গাম্ভীর্য, তেমনি বন্ধু বাৎসল্য। নইলে তিন হাজার সামন্ত রাজার সঙ্গ উপভোগ করতে পারতেন না।

তাঁর সময়ে পারস্যের রাজদরবার যেরূপ আড়ম্বরপূর্ণ ছিল, ইতোপূর্বে আর কখনও সেরূপ হয়নি। কিছু দিন পূর্বেই তিনি রোমীয়দের সাথে যুদ্ধ করে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়েছেন; কিন্তু তাঁর স্বভাবের কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন হুযাফা (রা)'- এর মাধ্যমে তাঁর নিকট ইসলামের আহবানলিপি প্রেরণ করলেন। যাত্রাকালে রাসূল (সা) তাঁকে বললেনঃ "তুমি বাহরাইনের শাসনকর্তা মুনযিরের হাতে পত্রখানা দিয়ে তাঁকে কিসরার নিকট পৌঁছাতে বলে দিও।" হযরত আবদুল্লাহ তাই করলেন। মুনযিরও যথাসময়ে পত্রখানা কিসরার দরবারে পৌঁছিয়ে দিলেন। পত্রটি ছিল এরূপঃ

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদের নিকট হতে পারস্যের প্রধান কিসরার সমীপে। যারা হিদায়াতের অনুসরণ করে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করে এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদাতের যোগ্য নয় এবং সমগ্র বিশ্বের লোকদেরকে সতর্ক করার জন্য তিনি আমাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন, তার প্রতি সালাম।

আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, মুক্তি লাভ করতে পারবেন। অন্যথায় অগ্নি উপাসক প্রজাদের পাপের জন্যও আপনি দায়ী হবেন।"

প্রবল প্রতাপান্বিত পারস্য সম্রাট এই পত্র পেয়ে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। তিনি পত্রখানি টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেললেন। এতেও তার ক্রোধ স্তিমিত হয়নি। তিনি তাৎক্ষণিক য়্যামেনের শাসনকর্তা 'বাযান'কে হুকুম দিয়ে পাঠালেন "মুহাম্মাদ (সা)-কে গ্রেফতার করে অনতিবিলম্বে আমার দরবারে হাজির কর।"

সম্রাটের আদেশ পাবার পর বাযান গ্রেফতারী পরোয়ানাসহ বারওয়াইয়া ও খরখস্রা নামক দুজন বিচক্ষণ রাজকর্মচারীকে মদীনায় প্রেরণ করলেন। কর্মচারীদ্বয় পথ চলতে চলতে ভাবতে লাগলেন, আমরা মহাপ্রতাপান্বিত পারস্য সম্রাটের দূত। আমাদের হাতে তারই প্রেরিত লিখিত পরোয়ানা। আমাদেরকে দেখে মুহাম্মাদ (সা) হয়ত ভয়ে কাঁপতে আরম্ভ করবেন।

দূতদ্বয় রাসূল (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার। তাঁর নূরানী চেহারা দেখেই ভয়ে তারা কাঁপতে লাগল। কাঁপতে কাঁপতে তাঁকে বেআদব সম্রাটের পরোয়ানা জানিয়ে প্রার্থনা করলঃ

আপনি তাঁর আদেশ পালন করুন, অন্যথায় তিনি রাগান্বিত হবেন এবং তাঁর অগনিত দুর্দান্ত সৈন্য প্রেরণ করে শুধু আপনাকে নয় বরং সমগ্র 'আরবদের ধ্বংস করে ফেলবেন। তিনি অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ও উগ্র স্বভাবের লোক।

রাসূল (সা) তাদের কথা শুনে বললেনঃ"তোমরা কাল আমার নিকট এসো, তোমাদের এ কথার উত্তর দিব। এখন তোমরা একটা কথা শোন। বল ত আল্লাহ্

প্রদত্ত পুরুষসুলভ সৌন্দর্যময় দাড়িগুলো কেটে এবং লম্বা গোঁফ রেখে তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডলকে এরূপ বিশ্রী করে রেখেছ কেন? তোমাদেরকে এ কুশিক্ষা কে দিয়েছে? তারা ভয়ে কম্পিত কণ্ঠে উত্তর করল ঃ এটা আমাদের প্রভুর (সম্রাটের) হুকুম। রাসূল(সা) বললেন ঃ কিন্তু আমাদের প্রভু আমাদের দাড়ি রাখতে এবং গোঁফ কেটে খাট করতে হুকুম দিয়েছেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় তোমরা প্রকৃত প্রভুর আদেশ অমান্য করে মনগড়া প্রভুর আদেশ পালন কর।

পরদিন দূতদ্বয় উপস্থিত হলে রাসূল (রা) বললেন ঃ "কার পরোয়ানা?" দূতদ্বয় বিস্মিত হয়ে বললঃ "কেন, শাহেনশাহ খসরু পারভেযের।"

খসরু পারবেয? সে ত জীবিত নেই। যাও বাযানকে গিয়ে বল, শীঘ্রই পারস্যের রাজধানী ইসলামের রাজ্যভুক্ত হবে। দূতদ্বয় বিস্মিত হয়ে একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। অগত্যা তারা য়্যামনে ফিরে গিয়ে বাযানকে সব কথা জানাল। বাযান এই সংবাদ শুনে স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন ঃ "কি আশ্চর্য কথা। সেদিন মাত্র সম্রাটের পরোয়ানা আসল। তাঁর কোন অসুখও ছিল না। হঠাৎ কি করে তার মৃত্যু হল? যদি আরবের রাসূলের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয় তবে আমি নিশ্চয়ই তাঁর প্রতি ঈমান আনব।"

বেশি দিন বিলম্ব হল না। নতুন সম্রাট শেরওয়াইয়াহ বাযানকে লিখে পাঠালেন ঃ "আমি আমার পিতা অত্যাচারী সম্রাটকে হত্যা করে পারস্য সিংহাসন অধিকার করেছি। আমি তোমাকে তোমার পদে বহাল রাখলাম। তুমি আমার আনুগত্য স্বীকার করে স্বীয় কর্তব্য পালন করতে থাক। আর সেই 'আরবীয় নবী সম্পর্কে দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কোন কিছুই করবে না।" সম্রাট শেরওয়াইয়াহ এই পত্র পাবার পর বাযান তার দু'পুত্রসহ ইসলাম গ্রহণ করেন। রাজদরবারের আরও বহু কর্মচারি তাঁকে অনুসরণ করে ইসলাম গ্রহণ করলেন। বাযান সাথে সাথেই মদীনায় লোক পাঠিয়ে তাঁদের সকলের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জানিয়ে দিলেন।

সম্রাট পারবেয রাসূল (সা)- এর পত্রের সাথে অসৌজন্য আচরণের পর তিনি বলেছিলেন ঃ "হে আল্লাহ্, তুমি তাঁর সম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে দাও।" অল্প দিনের মধ্যে তাই হল। আল্লাহর রাসূল (সা)-এর সাথে বেআদবি করার ফল এরূপই হয়ে থাকে।

# ভবিষ্যদ্বাণী - ছয়
## হযরত ইবরাহিম (আঃ) এর স্মৃতি স্মরণীয় হয়ে থাকবে

আল্লাহ তাআলা বলেন, **এটা (ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) এর কার্যসমূহ) পরবর্তীদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। (সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ১০৮)**

হযরত নূহ (আঃ) এর মহাপ্লাবনে সবকিছু ধ্বংস হবার কয়েক শ' বছর পর হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর জন্ম । তখন পৃথিবীতে আবার সভ্যতার প্রসার ঘটেছে। আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আঃ) কে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব প্রদান করেন। অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার মাধ্যমে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর সন্তানগণ এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনিই এ জাতির নাম রাখেন 'মুসলিম'।

মানব জাতির নেতৃত্ব দেওয়ার পূর্বে আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আঃ) কে অনেক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। যেমন–অগ্নিকাণ্ডে নিক্ষেপ, স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে নির্বাসন, পুত্রকে কুরবানী করা ইত্যাদি। এসব পরীক্ষায় তিনি সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন। আল্লাহ তাঁর উপর খুশী হন এবং তাকে খলিলুল্লাহ বা আল্লাহর বন্ধু হিসাবে মর্যাদা দান করেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁদের ত্যাগ ও কর্মসমূহকে কতযে উজ্জ্বলভাবে মানবজাতির নিকট স্মরণীয় করে রেখেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। ইহুদী, খ্রিস্টান, মুসলিম নির্বিশেষে সকল ধর্মের মানুষ শ্রদ্ধার সাথে তা স্মরণ করে।

আল্লাহ তাআলা হজ্জ ফরয করেছেন। হজ্জের সময় সাফা-মারওয়া সাঈ করা (দৌড়ান), জামরাতে কংকর নিক্ষেপ এবং কুরবানী করা ওয়াজিব। ইবরাহীম (আঃ) এর পূণ্যবতী স্ত্রী হাজেরার স্মরণে হজ্জের সময় সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়াতে হয়। শিশুপুত্র ইসমাইল যখন জনমানবহীন মরুভূমিতে পানির তৃষ্ণায় ছটফট করছিলেন তখন স্নেহময়ী মা হাজেরা দুই পাহাড়ের মাঝে পানির আশায় দৌড়িয়েছিলেন। কারণ মরুভূমিতে প্রখর রৌদ্রের সময় মরীচিকাকে পানি বলে ভ্রম হয়। পরে শিশু ইসমাইলের পদাঘাতে একটি অলৌকিক কূপের সৃষ্টি হয় যা জমজম কূপ নামে পরিচিত।

বিগত চার হাজার বছর ধরে এ কূপটি স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে রয়েছে। মাত্র পাঁচ ফুট গভীরতার এই বিস্ময়কর কূপটি যুগ যুগ ধরে মানব জাতিকে হাজেরা ও তাঁর পুত্র ইসমাইলের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। বিগত চার হাজার বছরে পৃথিবীর কত উত্থান-পতন ঘটল, কত পাহাড় নদী, নগর-বন্দর বিরাণ হল কিন্তু এই ছোট্ট কূপটির অস্তিত্ব টিকে রইল। এর পানি অত্যন্ত সুস্বাদু, পুষ্টিকর ও তৃপ্তিদায়ক। সবচে বিস্ময়কর ব্যাপার হল লক্ষ-কোটি গ্যালন পানি উত্তোলনের পরও একূপের পানি একটুও কমে না। হজ্জের সময় অন্তত বিশ লক্ষ লোক এ কূপের পানি পান করে। আশেপাশের অন্যান্য কূপের

পানি শুকিয়ে কূপের অস্তি-ত্ব বিলিন হয়ে যায় অথচ জমজম কূপের পানি কখনো শুকায় না। এতে জ্ঞানীদের জন্য চিন্তার খোরাক রয়েছে বৈকি।

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবরাহীম (আঃ) তার প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে কুরবানী দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। ইসমাইলের স্থানে আল্লাহ একটি জান্নাতী ভেড়া কুরবানীর ব্যবস্থা করেন। তাদের মহান কুরবানীর স্মরণে আজকের এই কুরবানীর ঈদের প্রথা। কী মহাসমারোহে বিশ্বব্যাপী এই কুরবানীর ঈদ উৎসব পালিত হয়। সকল স্বচ্ছল মুসলমান কুরবানী দিয়ে থাকেন। এমনকি যারা সঠিকভাবে ধর্মের অনুশাসন মানে না এমন মুসলমানও কুরবানী করে থাকেন।

ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর সন্তানদের কর্মকাণ্ড স্মরণীয় করে রাখার জন্য আল্লাহ তাআলার কী মোক্ষম ব্যবস্থা !

ইবরাহিম (আঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের বিশেষ কীর্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ কাবা শরীফ পুনর্নির্মাণ, মুসলিম জাতির প্রতিষ্ঠা এবং হজ্জ ও কুরবানীর প্রবর্তন। গোটা মানবজাতির কাছে বিগত প্রায় চার হাজার বছর ধরে ইবরাহিম (আঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁদের কর্মকাণ্ড এমনভাবে পরিচিত ও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে যেমনভাবে কেউ তাঁর নিজের পরিবারের কাছে পরিচিত থাকে। মানব ইতিহাসে এত দিন ধরে গোটা মানবজাতির কাছে এত বেশী স্মরণীয় হয়ে থাকার সৌভাগ্য আর কারও হয়নি। এতো আল কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তব প্রমাণ এবং তাঁর কৃত ভবিষ্যদ্বাণীর কতইনা সুন্দর বাস্তবায়ন।

# ভবিষ্যদ্বাণী - সাত
## কুরআন সংরক্ষিত থাকবে

**আল্লাহ তাআলা বলেন, নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই কুরআনকে হেফাযত করব।** (সূরা হিজর ঃ ৯)

আল্লাহর বাণী কুরআন কে সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এর মধ্যে বিন্দু-বিসর্গ পরিমাণ পরিবর্তন-পরিবর্ধন না হয়ে তা সংরক্ষিত থাকবে। আল্লাহ তাঁর এ ওয়াদা এভাবে পূরণ করেছেন যে, প্রত্যেক যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিলেন এবং রয়েছেন, যাঁরা কুরআনকে এমভাবে তাঁদের স্মৃতিপটে ধারণ করেছেন যে, এর প্রতিটি যের-যবর তথা স্বরচিহ্ন পর্যন্ত অবিকৃত রয়েছে। নাযিলের সময় থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর অতিবাহিত হয়েছে। এ দীর্ঘ সময়ে এ কিতাবের মধ্যে সামান্যতম কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন বা বিকৃতি ঘটেনি।

আল্লাহ তাআলা কুরআনকে মুখস্থ রাখার জন্য সহজসাধ্য করে দিয়েছেন। এটা একমাত্র কুরআনেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কুরআনের মত এত বিশাল গ্রন্থ তো দূরের কথা পৃথিবীর ছোট বড় আর কোন গ্রন্থই এভাবে কেউ মুখস্থ রাখে না বা রাখতে পারে না। এমন কি বাইবেল, তাওরাত, বেদ, ত্রিপিটক ইত্যাদি কোন ধর্মগ্রন্থও এভাবে মুখস্থ রাখা সম্ভব নয়। সারা দুনিয়ায় এ সব গ্রন্থের একজন হাফিযও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বিশ্বের সমস্ত কুরআনও যদি কোন কারণে ধ্বংস হয়ে যায় তা হলেও কুরআনের হাফেজদের মাধ্যমে অতি সহজেই পুনরায় লিখে নিয়ে সংরক্ষণ করা সম্ভব। এ অদ্ভুত সংরক্ষণ ব্যবস্থা আল কুরআনেরই বিশেষত্ব।

আল্লাহর সত্তা সর্বযুগে বিদ্যমান থাকবে। তাতে কোন সৃষ্টির হস্তক্ষেপ করার সাধ্য নেই। কুরআন আল্লাহর বাণী কেউ এতে কোন হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। যদিও যুগে যুগে কুরআনের বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্র হয়েছে আর কোন ধর্মগ্রন্থের বেলায় তা হয়নি। কারণ কুরআন শুধুমাত্র একটি ধর্মগ্রন্থ নয়, এটি একটি চিরস্থায়ী মুজিজা (Miracle) বা অলৌকিক বস্তু।

ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে কোন ভাষা ৫০০ বছরের বেশি অবিকৃতভাবে টিকে থাকে না। কিন্তু কুরআনের ভাষা হবার কারণে আরবী ভাষা এর ব্যতিক্রম। প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বের কুরআনের আরবী ভাষা এখনো অবিকৃত রয়েছে ও স্বাভাবিকভাবে মানুষের বোধগম্য রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। অথচ বেদের মূল ভাষা সংস্কৃত, বাইবেলের ভাষা সুরিয়ানী এবং তাওরাতের ভাষা হিব্রু এখন মৃত ভাষা (Dead Language)। মূল ভাষার অস্তিত্ব না থাকায় অন্য ভাষায় অনূদিত হতে হতে ঐ সব ধর্মগ্রন্থ বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কুরআনকে অবিকৃত রাখার জন্য আল্লাহ তায়ালা কুরআনের মূল ভাষা আরবীকেও স্থায়ী ও অবিকৃত রেখেছেন। কুরআন পৃথিবীর সবচে' প্রাচীন গ্রন্থ যা তার মূল ভাষায় পাঠ করা হয় এবং কুরআনই সর্বযুগে সর্বাধিক পঠিত, সর্বাধিক মুখস্থকৃত এবং সর্বাধিক অনুসৃত গ্রন্থ।

প্রথম যুগের হাতে লেখা কুরআনের কয়েকটি কপি এখনো ইস্তাম্বুলে এবং তাসখন্দের যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এগুলোর সাথে বর্তমান যুগের কুরআনের কোন পার্থক্য নেই। ফ্রান্সের বিখ্যাত মনীষী ডঃ মরিস বুকাইলী নিজে এটা পরীক্ষা করে দেখেছেন বলে তাঁর 'বাইবেল কুরআন বিজ্ঞান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

বিগত দেড় হাজার বছর সংরক্ষিত থেকে আল কুরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়ে রয়েছে।

# ভবিষ্যদ্বাণী - আট
## ইহুদীরা চিরদিন লাঞ্ছিত ও অপমানিত থাকবে

**আল্লাহ তাআলা বলেন, "আল্লাহ্ প্রদত্ত ও মানব প্রদত্ত আশ্রয় ব্যতীত তারা (ইহুদীরা) যেখানে যাবে সেখানেই তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও অবমাননা পুঞ্জিভূত হয়ে থাকবে। তাঁরা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং হীনগ্রস্থ হয়েছে। এ জন্য যে, তারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করত এবং অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করত। তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী"** (সূরা ইমরান ঃ ১১২)

ইহুদীরা উপরোক্ত দু'অবস্থা ব্যতীত সর্বত্র ও সব সময় লাঞ্ছিত ও অপমানিত থাকবে। (১) আল্লাহ প্রদত্ত আশ্রয়ের মাধ্যমে অব্যহিত পেতে পারে। (২) অন্যদের আশ্রিত হয়ে বা শান্তি চুক্তির মাধ্যমে নিজেদেরকে এ অবমাননা থেকে মুক্ত রাখতে পারবে।

ইহুদী জাতি অতি প্রাচীন ও ধূর্ত জাতি। অপরাধ প্রবণতা এদের মজ্জাগত। এরা নিজেদেরকে হযরত মূসা (আঃ) এর অনুসারী বলে দাবী করে এবং তাকেই শেষ নবী মনে করে।

এক সময় (খৃস্টপূর্ব ১৮ শতকের পরে) আল্লাহ তায়ালা এদেরকে পৃথিবীতে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। পৃথিবীর শাসন কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। অনেক নবী রাসূল এদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এদেরকে সম্মানিত করেছিলেন। সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে এরা অনেক উৎকর্ষ সাধন করেছিল। মিশরের অত্যাচারী ফেরাউনের অত্যাচার থেকে আল্লাহ তাআলা এদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তারা দীর্ঘদিন ধরে বিনা পরিশ্রমে আল্লাহর পক্ষ থেকে মান্না ও সালওয়া নামক সুস্বাদু খাদ্য লাভ করেছিল।

এত কিছুর পরেও এই ইহুদী জাতির অপরাধ প্রবণতা ও অবাধ্যতা এতদূর পৌঁছেছিল যে, অনেক নবী- রাসূলকে তারা হত্যা করেছিল। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "মানুষের মধ্যে ইহুদী ও মুশরিকরাই মুসলমানদের প্রতি সবচে' বেশি বিদ্বেষ পোষণকারী।" (সুরা মায়িদা, আয়াত ঃ ৮২)

নানা রকম অপরাধ করার কারণে আল্লাহ্ তাআলা ইহুদী জাতিকে সম্মানের আসন থেকে নামিয়ে অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত করেছেন। নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করে চিরদিনের জন্য লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে রেখেছেন। শনিবারের বিধান লংঘনের অপরাধে এদের কিছু সংখ্যককে আল্লাহ তাআলা চেহারা বিকৃত করে দিয়েছিলেন। যুবক-যুবতীরা বানরের এবং বয়স্করা শুকরের আকৃতি পেয়েছিল। কুরআনে বলা হয়েছে, যুগে যুগে অনেক শাসকের দ্বারা ইহুদী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল।" কুরআনের উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ইহুদীদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভব হবে না। অথচ দেখা যায় ইসরাইল নামে তাদের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উত্তর সুস্পষ্ট–কেননা

এ রাষ্ট্র প্রকৃত পক্ষে ইসরাইলের নয়; বরং আমেরিকা ও বৃটেনের একটি ঘাঁটি। এ রাষ্ট্র নিজস্ব সম্পদ ও শক্তির উপর নির্ভর করে একমাসও টিকে থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ। পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানশক্তি মুসলিম বিশ্বকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে ইসরাইল নাম দিয়ে একটি সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেছে। তাদের পক্ষপুষ্ট ও আশ্রিত হয়ে নিছক ক্রিড়নকরূপে ইসরাইলীরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। তাও অত্যন্ত লাঞ্ছনা ও অপমানের ভেতর দিয়ে।

আমরা এখানে ঐশীগ্রন্থ কুরআন ও বাইবেলের আলোকে এবং ঐতিহাসিক তথ্য থেকে বনী ইসরাঈল বা ইহুদী জাতির ইতিহাস ঐতিহ্য, উত্থান, পতন ও তাদের ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করতে চেষ্টা করব। এ আলোচনা থেকে ইহুদীদের সম্পর্কে আল কুরআনের ভবিষদ্বাবাণীর সত্যতা আরও সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হবে।

**উৎপত্তি ও নামকরণ**

মানব জাতির আদি পিতা প্রথম মানুষ আদম (আঃ) এর অধস্থন ২০ তম পুরুষ ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন মানব সভ্যতার প্রাণপুরুষ। ওল্ড টেস্টামেন্টের (তাওরাত) ভাষ্য মতে তাঁর জন্মস্থান প্রাচীন বেবিলনের (বর্তমান ইরাক) অন্তর্গত 'উড়' নগরীতে। তাঁর জৈষ্ঠ্য পুত্র ইসমাইল (আঃ) এর বংশে হযরত মুহাম্মদ(সঃ) এর জন্ম হয়। ইবরাহীম (আঃ) এর দ্বিতীয় পুত্রের নাম ইসহাক (আঃ)। ইসহাক (আঃ)'এর স্ত্রীর নাম রেবেকা। এই ইসহাক-রেবেকা দম্পতির দুই সন্তানের একজন হলেন ইয়াকুব (আঃ) (Jacob)। ইসহাক (আঃ) এর অপর নাম বা খেতাব 'ইসরাঈল'। এজন্য তাঁর বংশধরদেরকে বলা হয় বনী ইসরাঈল। ইয়াকুব (আঃ) এর বারো জন পুত্র সন্তানের মধ্যে ছিল ইয়াহুদা নামে এক পুত্র যে ছিল সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। এজন্য ইয়াহুদার নামানুসারে বনী ইসরাঈলীদেরকে ইয়াহুদী নামেও সম্বোধন করা হয়। আসলে বনী ইসরাঈল ও ইয়াহুদী একই জাতির দুটি নাম। ইয়াকুব (আঃ) এর বার পুত্রের এক পুত্র ইউসুফ (আঃ) নবুওয়াত লাভ করেন এবং একই সাথে মিশরের রাজত্ব লাভ করেন। ইসরাঈলীদের মধ্যে যুগে যুগে বহু নবীর আবির্ভাবে তাঁরা ধন্য হয়। আল কুরআনে বর্ণিত দৃষ্টান্তমূলক কাহিনী সমূহের অধিকাংশ কাহিনী বনী ইসরাঈল জাতিকে কেন্দ্র করে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত মুসা (আঃ) এর উপর অবতীর্ণ গ্রন্থ তাওরাত (Torah) এবং দাউদ (David) (আঃ) এর উপর অবতীর্ণ যাবুর এই দুই গ্রন্থকে একত্রে প্রাচীন বাইবেল (Old Testament) বলা হয় এবং ওল্ড টেস্টামেন্টের অনুসারীদেরকে ইয়াহুদী বলা হয়।

বনী ইসরাইল (ইয়াহুদী) পুরোহিতরা নবী মুসা (আঃ) হতে সুলাইমান (আঃ) এর যামানা পর্যন্ত তাওরাত ও যাবুর কিতাবের মূল প্রাণ ও পবিত্রতা যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও অনুসরণ করে আসছিল। এই জন্য এ জাতির মানমর্যাদা ছিল তদানীন্তন জাতিসমুহের মধ্যে সকলের উর্দ্ধে। তৎকালীন বিশ্বের সম্মানিত জাতি হিসেবে সুন্দরতম জীবন যাপনের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে বহু নিয়ামত দান করেন। সে

সব নিয়ামতের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ ১. তাওরাতের বিধানসমূহ, ২. বারটি গোত্রের জন্য শুষ্ক মরুর বুকে বারটি প্রস্রবণ, ৩. তীহ প্রান্তরে, মান্না ও সালওয়া নামক সুস্বাদু খাদ্য দান এবং ৪. স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফিলিস্তিন নামে অঙ্গীকারাবদ্ধ দেশ।

আল্লাহ তাআলা এসব নেয়ামতের চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বনী ইসরাঈলদেরকে বলেন, " হে বনী ইসরাইল, তোমরা আমার প্রদত্ত নিয়ামতের চুক্তির কথা স্মরণ কর। আর তোমরা আমার সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ ক'র না। কেননা, যতদিন তোমরা চুক্তিমত কাজ করবে ততদিন আমি তোমাদেরকে সর্বপ্রকার নিয়ামত দিতে থাকব। আর আমাকে ভয় কর।" (সুরা বাকারা, আয়াত ঃ ৪০-৪১)।

স্মরণ কর সে সময়ের কথা যখন আল্লাহ তোমাদের মধ্যে নবী পাঠিয়ে তোমাদেরকে শাসক বানিছেন। (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ঃ ১০)।

বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তাআলার অন্যতম নেয়ামত হল বাদশাহ ফেরাউনের দাসত্ব ও অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তি। হযরত মুসা (আঃ) বনী ইসরাঈলদেরকে নিয়ে মিশর ত্যাগ করে ফিলিস্তিনে হিযরত করার জন্য আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট হন। ইতোমধ্যে বাদশা ফেরাউন তাঁদের পিছু ধাওয়া করতে এসে দলবলসহ লোহিত সাগরে ডুবে মারা যায়। মূসা (আঃ) তাঁর কাফেলা নিয়ে নিরাপদে সাগর পাড়ি দিয়ে সিনাই মরু অঞ্চলে পৌছান। সেখানে তারা ৪০ বছর অবস্থান করেন। জীবন ধারণের জন্য মৌলিক পানির অভাব ছিল মরুভূমির মধ্যে তাদের সবচে বড় সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আল্লাহ্ তাআলা তাদের বারটি গোত্রের জন্য বারটি প্রস্রবণ সৃষ্টি করেন।

এই সিনাই অঞ্চলে অবস্থিত তূর পাহাড়ের পাদদেশে মূসা (আঃ) তাওরাতের বিধানসমূহ প্রাপ্ত হন এবং তাওরাতের অনুসরণ করে জীবন যাপনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। নিরাপদ ও নিশ্চিত জীবন যাপনের জন্য মান্না ও সালওয়া নামক সুখাদ্য নিয়ামত হিসেবে প্রাপ্ত হন। তাওরাতের বিধানসমূহ অনুসরণের কারণে বনী ইসরাঈল জাতি সাফল্যের শীর্ষে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। হওরত মুসা (আঃ) এর মৃত্যুর পর তারা নবী ইউশা (আঃ) (যোশুয়া) এর নেতৃত্বে জর্ডান নদীর পূর্ব ও পশ্চিম তীরের কিয়দংশ দলখ করে সেখানে বসতি স্থাপন করে। খ্রিস্টপূর্ব ১০২০ অব্দের দিকে তারা বাদশাহ তালুতের নেতৃত্বে অত্যাচারী বাদশাহ জালুতকে পরাজিত ও নিহত করে ফিলিস্তিন ভূখন্ডে প্রথমবারের মত ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এবং খ্রিস্টপূর্ব ৯২০ অব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ দিন যাবৎ তারা সুখী, সমৃদ্ধ ও পবিত্র জীবন যাপন করে। খ্রিস্টপূর্ব ৯২০ অব্দে হযরত সুলায়মান (আঃ) এর রাজত্বের শেষ পর্যন্ত ছিল বনী ইসরাঈলদের স্বর্ণযুগ।

### ইহুদি জাতির অধপতন

নবী সুলাইমান (আঃ) এর ইনতেকালের পর থেকে ইহুদীদের অধপতনের সূচনা হয়। এ সময়ে তাদের মধ্যে আত্মকলহের কারণে ফিলিস্তিনে অবস্থিত ইসরাঈল

রাষ্ট্রটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে উত্তর অঞ্চলের নাম ইসরাঈল থেকে যায় এবং দক্ষিণের অংশের নাম হয় জুদী রাষ্ট্র।

তাওরাত কিতাবের সংরক্ষণ ও অনুসরণের কারণে ইহুদী পুরোহিতগণ সমাজে সম্মান ও নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। পরববর্তীকালে তাদের ঈমান আমলে ঘাটতি শুরু হয়। ইহুদী পুরোহিতরা তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে পবিত্র তাওরাতের পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটাতে শুরু করে। ফলে শুরু হয় তাদের অধপতন। নবী সুলাইমান (আঃ) এর পরবর্তী যে সব নবী ও দ্বীনি আলেমগণ পুরোহিতদের দুষ্কর্মের প্রতিবাদ করতেন, প্রভাবশালী পুরোহিতদের নির্দেশে ঐ সকল নবী ও আলেমদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হত - যাদের সংখ্যা দুই শতেরও বেশি ছিল।

এছাড়া ইহুদীরা বড় দুইটি শিরকী গুণাহে লিপ্ত হয়। তার একটি হল মূর্তিপূজা এবং অপরটি ওয়ায়েরকে আল্লাহর পুত্র বলে আখ্যায়িত করা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনের সূরা তওবার ৩০ নং আয়াতে বলেন, " এবং ইহুদীরা বলে ওয়াযের (ইযরা) আল্লাহর পুত্র এবং খ্রিস্টানরা বলে , মসীহ (ঈসা) আল্লাহর পুত্র।"

ওয়ায়ের ছিলেন ইহুদীদের মধ্যে তাওরাত কিতাবের একজন আলেম ও হাফেজ। খৃস্টপূর্ব ৭১২ অব্দে এসিরিয়দের হাতে পবিত্র জেরুজালেম নগরী ধ্বংস হওয়ার সময় তিনি নগরীর ধ্বংসস্তুপ দেখে বলেছিলেন, "আল্লাহ একে মরণের পর (ধ্বংসের পর) কিরূপে পুনরুজ্জীবিত করবেন?" এই উক্তির পর আল্লাহ তাআলা ওয়ায়েরের মৃত্যু ঘটান এবং মৃত অবস্থায় একশত বছর থাকার পর আবার জীবিত করেন। আল্লাহ ওয়ায়েরকে জিজ্ঞাসা করেন, "মৃত অবস্থায় কতদিন ছিলে ? জবাবে তিনি বলেন, একদিন বা একদিনের কিছু অংশ। তখন আল্লাহ বলেন, মৃত অবস্থায় সে একশত বছর ছিল।" (আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াতঃ ২৫৯)। পবিত্র জেরুজালেম নগরী ধ্বংসের সময় তাওরাত কিতাব সমূহ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। একশ বছর পর জীবিত হয়ে ওয়ায়ের জেরুজালেম নগরীকে পূর্বের অবস্থায়ই দেখতে পান এবং সম্পূর্ণ তাওরাত কিতাব মুখস্থ পড়ে শুনান। এর ফলে ইসরাঈলীরা ওয়ায়েরকে আল্লাহর পুত্র বলে আখ্যায়িত করে।

উল্লেখিত দুটি প্রধান শিরক এবং তাওরাত কিতাব বিকৃতি সাধন এবং আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা-চুক্তি লংঘনের কারণে ইহুদীরা অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত হয়।

এর ফলশ্রুতিতে বেবিলনের রাজা নেবকাদনেজার (বখত নাসার) খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে ইহুদীদের আবাসভূমি ফিলিস্তিন দখল করে নিদারুণ ধ্বংসলীলা ও গণহত্যা চালায়। এ ঘটনার ইঙ্গিত পবিত্র কোরআনে রয়েছে। প্রাণে বেঁচে যাওয়া ইহুদীরা নিজ আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং লাঞ্ছিত ও উদ্বাস্তু জীবন যাপন করতে থাকে। এদের বেশ কিছু সংখ্যক লোক ইউরোপের ইটালী,

পোল্যান্ড, গ্রীস ও জার্মানিতে আশ্রয় নেয়। বাকী অংশ মিশর, খাইবার অঞ্চল ও পরবর্তীতে মদীনায় গিয়ে বসতি স্থাপন করে। তাদের অভিশপ্ত চরিত্রের কারণে যে লোক যেখানে আশ্রয় নিত সেখানে বেশিদিন টিকতে পারতো না। বিশ্ববিখ্যাত কবি ও নাট্যকার সেক্সপিয়ার তাঁর Marchant of Venice নাটকের শাইলক চরিত্রের মাধ্যমে ইহুদীদের হীন চারিত্রিক বৈশিষ্ট ফুটিয়ে তুলেছেন।

ঈহুদীদের চরিত্র ও অভিশপ্ত জীবন প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ৬১ নং আয়াতে বলেন, "এবং তাদের অপকর্মের প্রতিফল স্বরূপ আল্লাহ কর্তৃক অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত হল, যেহেতু তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে, নবী রাসূলদের হত্যা করে চরমভাবে সীমা লঙ্ঘন করেছে।" তাদের এই লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আর কোনদিন শেষ হবে না এবং কোন স্থায়ী আবাসভূমি পাবে না বলে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে।

"অবশ্যই আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত ইহুদীদের উপর এমন লোক পাঠাতে থাকবেন যারা তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দান করতে থাকবে। আর আমি তাদেরকে বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি দেশময় বিভিন্ন শ্রেণীতে (সূরা আরাফ, আয়াতঃ১৬৭-১৬৮)।

তারা চিরদিন উদ্বাস্তু হিসাবেই থাকবে তবে শেষকালে তাদের ধ্বংসের প্রাক্কালে এক জায়গায় একত্রিত হবে বলে হাদীসে উল্লেখ আছে। কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য মতে হযরত ঈসা (আঃ) এর পৃথিবীতে পুনরাগমনের পর ইহুদী জাতির অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এদের কিছু সংখ্যক ঈসা (আঃ) এর আহ্বান অনুসরণ করে মুসলিম হয়ে যাবে এবং অবশিষ্টদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হবে।

প্রায় আড়াই হাজার বছর উদ্বাস্তু ও লাঞ্ছিত জীবন যাপনের পর এই শতাব্দীতে এসে এক স্থানে একত্রিত হওয়া (১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে) ইহুদী জাতির চূড়ান্ত ধ্বংসের আলামত বা পূর্বাভাস।

## বনী ইসরাঈল বা ইহুদীদের পতনের কারণ

একটি সার্বজনীন জিজ্ঞাসা এই যে, আল্লাহর নেয়ামত প্রাপ্ত বনী ইসরাঈল জাতি কেন নেয়ামত ও নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হল। কুরআন ও হাদীসে এর কারণসমূহ বর্ণিত রয়েছে যা মুসলিম অমুসলিম সবার জানা আবশ্যক। এর বহুবিধ কারণের মধ্যে দুটি কারণ প্রধান। প্রথমতঃ এরা জাতিগতভাবে খামখেয়ালী, অহংকারী, ধর্মান্ধ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী, নিষ্ঠুর ও অপরাধপ্রবণ।

তারা নিজেদের সম্পর্কে মারাত্মক ভুল ধারণায় নিমগ্ন ছিল। সম্মানিত নবীদের বংশধর এবং পুণ্যবান লোকদের সঙ্গে তাদের নিকটতম সম্পর্ক থাকায় এবং আল্লাহর নেয়ামত প্রাপ্তিতে তারা গর্ববোধ করত। নিজেদেরকে অন্যদের চেয়ে অনেক সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত মনে করত। তাই তারা আদৌ বিশ্বাস করত না যে, অপরাধ

**করলে** পরকালে তাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ তাদের মধ্যে সবাই এই ধারণা পোষণ করত যে, যেহেতু তারা বনী ইসরাঈলী সেহেতু দোযখের আগুন তাদের স্পর্শ করবে না। একান্ত কোন কারণে যদি কাউকে দোযখের শাস্তি পেতেই হয় তবে তা কয়েকদিনের জন্য মাত্র (আল কুরআন)।

এ জন্য তারা কোন অন্যায় অপরাধ করতে পিছপা হতো না। ফলে তারা নিয়ামত থেকে বঞ্চিত ও নিজ বাসভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে দেশে দেশে বাত্যাতাড়িতের মত ঘুরে বেড়ায়। এর প্রায় আড়াই হাজার বছর পর চলতি শতাব্দীতে তারা খ্রিস্টান শক্তির সতায়তায় মুসলিম ফিলিস্তিন রাস্ট্র জবর দখল করে ইসরাঈল নামে একটি রাষ্ট্র গঠন করে যা জন্ম থেকে বিশ্বের বুকে একটি অশান্তির বিষফোড়া হয়ে রয়েছে।

## ঈহুদীদের সত্য প্রত্যাখ্যান

ইহুদীরা নিজেদেরকে মূসা (আঃ) এর উম্মত (followers) বলে দাবী করে। শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর পূর্বের নবী ঈসা (আঃ) কে তারা অস্বীকার করে। যদিও পূর্ব যুগের সকল নবী তাঁদের উম্মতদেরকে শেষ নবীর আগমনের কথা বলতেন এবং ঐশী কিতাবসমূহে তার উল্লেখ ছিল। তাওরাত ও ইঞ্জিলেও মুহাম্মাদ (সঃ) এর আগমনের কথা তাঁর নাম-ধামসহ উল্লেখ ছিল। হযরত মূসা (আঃ) এর ইনতেকালের পর হযরত দাউদ (আঃ) ও সুলাইমান (আঃ) এর রাজত্বকালে বনী ইসরাঈলগণ প্রতিশ্রুত ভূমি ফিলিস্তিনে একশত বছর ধরে সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপন করে। এরপর তাদের মধ্যে জাতিগত ধর্মান্ধতা ও অপরাধ প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। কোন নবী বা ধর্ম প্রচারকের উপদেশ তাদের কাছে অসহ্য ছিল। তাই তারা নবীদেরকে পর্যন্ত হত্যা করতে দ্বিধা করত না। তাদের এই নাজুক পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা তাদের মনে নবীর প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য হযরত ঈসা (আঃ) কে তাদের বংশ থেকে পিতা ছাড়াই মায়ের গর্ভে সৃজন করেন এবং মুজেজা বা অলৌকিক শক্তি দান করেন (সূরা মারিয়াম)। নবুওতের দায়িত্ব দিয়ে সেই সাথে তাওরাত কিতাবের সহজতর সংস্করণ রূপে ইঞ্জিল (Bible) কিতাব দান করেন। কিন্তু খুব নগণ্য সংখ্যক লোকই তাঁর প্রতি ঈমান আনে। উপরোক্ত তারা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র আঁটে। আল্লাহর কুদরতে তারা ঈসা (আঃ) সদৃশ তাদেরই এক ব্যক্তিকে শুলে বিদ্ধ করে হত্যা করে। এদিকে ঈসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় চতুর্থ আসমানে গমন করেন এবং পরবর্তীতে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় রয়েছেন।

নবী হযরত ঈসা (আঃ) এর অন্তর্ধানের পর বনী ইসরাঈলের অধিকাংশ লোক প্রাচীন বাইবেল (Old testament) বা তাওরাতের অনুসারীই থেকে যায়, ক্ষুদ্রতর অংশ যথা নিয়মে ইনজিল (Bible) এর অনুসারী হয়। উল্লেখ্য তাওরাতের অনুসারীদেরকে ইহুদী ও বাইবেল বা ইঞ্জিলের অনুসারীদেরকে নাসারা বা খ্রিস্টান বলা

হয়। এই উভয় দলই তাওরাত ও ইঞ্জিলের শিক্ষাকে বিকৃত করে ধর্মের নামে শোষণের রাজত্ব কায়েম করে।

অবশেষে এই শোষণ ও জুলুমের নাগপাশ থেকে বিশ্ব মনবতাকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহকে রাহমাতুল্লিল আলামীন হিসেবে প্রেরণ করেন। পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের সারৎসার হিসেবে কুরআন নাজিল করেন যা মানব জাতির প্রতি আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ ও চিরস্থায়ী গাইড বুক।

ইহুদীরা তাদের ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত শেষ নবী মুহাম্মাদ (সঃ) এর আগমনের প্রতীক্ষায় থাকতো। তারা মনে করত শেষ নবীর আগমনে তাদের হাজার বছরের দুঃখ-দুর্দশা, লাঞ্ছনা-গঞ্জনার অবসান হবে।

কিন্তু তারা যখন দেখল, শেষ নবী তাদের বংশে জন্ম গ্রহণ না করে অন্য বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন তখন তারা তাঁকে জেনে বুঝে প্রত্যাখ্যান করে। ঈসা (আঃ) এর মত হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে হত্যার জন্য ইহুদীরা নানা রকম ষড়যন্ত্র করে। তাঁর বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধে তারা অংশগ্রহণ করে। এমনকি খাদ্যে বিষ মিশিয়ে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করে কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশ্য ইহুদীদের মধ্যে থেকে কিছু সংখ্যক সত্য সন্ধানী লোক ইসলাম গ্রহণ করেন।

**ইহুদী জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ**

প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে উদ্বাস্তু জীবন যাপনের পর বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তারা একজোট হয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করেছে। বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোর সহায়তায় তারা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে জবর দখল করে ইসরাঈল নামক একটি আশ্রিত রাষ্ট্র গঠন করে। গোটা বিশ্বে ইহুদীদের সংখ্যা এক কোটি বিশ লাখের মত। এই অল্প সংখ্যক লোকের একটি মাত্র দেশ ইসরাঈল। অন্যের আশ্রয় ছাড়া একদিনও এদের টিকে থাকার শক্তি নেই। অথচ এই ক্ষুদ্র একটি দেশই বর্তমান বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্টের মূল কারণ। হতে পারে এদের কারণেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হবে। বলাই বাহুল্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হলে তা হবে মারাত্মক এবং বর্তমান বিশ্ব সভ্যতা ধ্বংসও হয়ে যেতে পারে।

ফিলিস্তিন মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদী এই তিন প্রধান ঐশী ধর্মাবলম্বীদের নিকটই একটি গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র স্থান। ফিলিস্তিন ভূখন্ডটি এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশের সংযোগস্থলে অবস্থিত। ফলে এর ভৌগলিক গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীন কালে নবী ও রাসূলগণ ফিলিস্তিন ভূখন্ডে এসে ধর্ম প্রচার করতেন।

পবিত্র জেরুজালেম নগরী ফিলিস্তিনে অবস্থিত। এই নগরে অবস্থিত পবিত্র বাইতুল মাকদাস বা মসজিদুল আকসা। এ নগরটি ইহুদী বা বনী ইসরাঈলদের নিকট পবিত্র হবার কারণ হল হযরত সুলাইমান (আঃ) কর্তৃক নির্মিত বাইতুল মাকদাস তাদের

নিকট অতি সম্মানিত। এই নগরের বেথেলহেমে হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্ম। এজন্য খ্রিস্টানদের নিকটও এ নগর অতি সম্মানিত। মুসলমানদের নিকট এ নগর পবিত্র হওয়ার কারণ হল কাবা শরীফের পূর্বে মসজিদুল আকসা ছিল মুসলমানদের কেবলা। মিরাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই মসজিদে এসে সকল নবীর সঙ্গে একত্রে নামাজ পড়েন। সুতরাং ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুসলিম তিনটি ঐশী ধর্মাবলম্বীদের কাছেই জেরুজালেম একটি গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র স্থান।

## ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

আল্লাহ তাআলা বলেন, **"আর আমি তাদেরকে (ইহুদীদেরকে) বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি দেশময় বিভিন্ন শ্রেণীতে"** (সূরা আরাফ,আয়াতঃ১৬৮)।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত ইহুদীরা ফিলিস্তিনে তাদের হৃত ভূমি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপি বিশেষতঃ ইউরোপে যে আন্দোলন শুরু করে তাকে ইহুদী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা Zionism বলে। অস্ট্রিয়ায় বসবাসরত থিওডোর হাযল এ আন্দোলনের আহবায়ক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে সুইজারল্যান্ডের বাসেল শহরে প্রথমবারের মত ইহুদী সম্মেলন ডেকে আন্দোলনের কর্মসূচী প্রণয়ন করেন।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় হিটলার বহু ইহুদীকে হত্যা করে। ফলে ইহুদীরা দলে দলে আমেরিকা মহাদেশে আশ্রয় নেয়। তারা ১৯৪২ সনে নিউইয়র্ক শহরে এক সম্মেলন ডেকে ফিলিস্তিনে একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী জানায়। এরপর ১৯৪৮ সনের ১৫ই মে বৃটিশ ষড়যন্ত্রে ও মদদপুষ্ট হয়ে ইহুদীরা ফিলিস্তিনী মুসলমানদেরকে বিতাড়িত করে সেখানে জোরপূর্বক ইহুদী রাষ্ট্র ঘোষণা করে। বৃটেনের ছত্রছায়ায় ইহুদীরা বিভিন্ন দেশ থেকে ফিলিস্তিনে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। এদিকে ইহুদী অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ফলে মুসলিম ও ইহুদীদের মধ্যে ব্যাপক দাঙ্গা হাঙ্গামা চলতে থাকে।

বৃটিশ সরকার ফিলিস্তিনীদের প্রতিরোধ সংগ্রাম এত জোরদার হচ্ছে দেখে জাতিসংঘ মহাসচিবকে জরুরী অধিবেশন ডাকার আহ্বান জানায়। পরবর্তীতে জাতিসংঘ ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কাউন্ট ফোক বার্নাদাতে কে (Count Folke Barnadatte) সালিশ নিযুক্ত করে। জাতিসংঘের নির্বাচিত সালিশ ফিলিস্তিনে গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করে তার প্রতিবেদন পেশ করেন। এই প্রতিবেদন ইহুদীদের মনঃপূত না হওয়ায় তারা জাতিসংঘের উক্ত সালিশকে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ই জুলাই জেরুজালেমে হত্যা করে।

১৯৪৮ সালে ইসরাঈল নামক ইহুদী রাষ্ট্রটি গঠিত হবার পর আরব দেশগুলোর সাথে তাদের তিনটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইহুদীরা ফিলিস্তিন ছাড়াও পার্শ্ববর্তী দেশ মিশর, সিরিয়া, জর্ডান ও লেবাননের কিছু অংশ দখল করে। ১৯৫৮

খ্রিস্টাব্দে প্রথম যুদ্ধে আরবরা ভাল অবস্থান করলেও পরবর্তী ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ২য় যুদ্ধে এবং ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় আরব ইসরাঈল যুদ্ধে ইসরাঈলের বিজয়ের মূলে ছিল দেশটির পারমাণবিক অস্ত্র। যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ইসরাঈল ১৩ টি পারমাণবিক বোমা প্রস্তুত করে রেখেছিল। প্রতিটি বোমার ক্ষমতা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত বোমার সমান। পরিকল্পনা ছিল যুদ্ধের গতি আরবদের অনুকুলে গেলে ইসরাঈল পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করবে। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ ই অক্টোবর মিসর ও সিরিয়া একযোগে ইসরাঈলে হামলা চালায়। ইসরাঈলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। ৮ই অক্টোবর ইসরাঈলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিসেস গোল্ডামেয়ার ও তার মন্ত্রীসভা পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তদানিন্তন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারকে এ সিদ্ধান্ত জানানো হলে তারা বিমান যোগে দ্রুত ইসরাঈলে ব্যাপক সামরিক সহায়তা প্রেরণ করে। ফলে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। মার্কিন সামরিক সহায়তা প্রদানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তদানীন্তন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বলেন, ইসরাঈল পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। এ থেকে বিরত রাখার জন্য তাকে সামরিক সহায়তা দেয়া হয়।

যাহোক ইসরাঈল যদি পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করতো তাহলে সিরিয়া ও মিশরে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকির ভাগ্য বরণ করতে হতো। লক্ষ কোটি মুসলমানের প্রাণ হানি ঘটত।

ক্ষুদ্র জনসংখ্যার ক্ষুদ্র দেশ ইসরাঈল। আয়তনে বাংলাদেশের চেয়ে ছোট হলেও পারমাণবিক শক্তি হিসেবে ভারত ও পাকিস্তানের অগ্রগামী। ষাটের দশকেই দেশটি পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হয়। ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তারা বুঝতে পেরেছিল যে, চারদিকে আরব শক্তি পরিবেষ্টিত অবস্থায় পারমাণবিক বোমাই হচ্ছে রাষ্ট্র হিসেবে তাদের টিকে থাকার গ্যারান্টি। এজন্য শুরু থেকেই তারা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির প্রচেষ্টায় লেগে যায়। ইহুদীরা অত্যন্ত মেধা-বুদ্ধির অধিকারী। বিভিন্ন দেশ থেকে বহু মেধাবী বিজ্ঞানী ইসরাঈলে অভিবাসী হিসেবে বসতি স্থাপন করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আর্নেস্ট ডেভিট বার্গম্যান, যিনি ইসরাঈলের পারমাণবিক বোমার জনক। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানীদের মধ্যে বহু সংখ্যক ঈহুদী বিজ্ঞানী রয়েছে। এ সংখ্যা অন্য যে কোন জাতির তুলনায় অনেক বেশি।

ইসরাঈল পারমাণবিক বোমার জোরে আরবদের বিরুদ্ধে অন্ততঃ দুটি যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। মুসলিম দেশ ইরাকের পারমাণবিক স্থাপনা উড়িয়ে দিয়েছে। নারী শিশুসহ মুসলমানদের রক্তে প্রতিদিন আরবভূমি রঞ্জিত করছে। দম্ভ ভরে ঘোষণা দিয়ে ফিলিস্তিন মুসলিম নেতাদেরকে হত্যা করছে। সম্প্রতি শীর্ষ হামাস নেতা আবদেল মজিদ রানতিসি এবং হামাসের প্রতিষ্ঠাতা আধ্যাত্মিক নেতা শেখ ইয়াসীনকে বোমা মেরে হত্যা করেছে। ফিলিস্তিনী মুসলমানদের ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়ে বসতি থেকে উচ্ছেদ করছে। আর তাদের সমস্ত উপায় উপকরণ যোগান দিচ্ছে তথাকথিত গণতন্ত্র

ও মানবাধিকারের প্রবক্তা আমেরিকা, ফ্রান্স, নরওয়ে পোল্যান্ড, বর্ণবাদী দক্ষিণ আফ্রিকা, জার্মানি প্রভৃতি দেশ। এদের সহায়তাই ক্ষুদ্র দেশ ইসরাঈল পারমাণবিক শক্তির অধিকারী। যা কিনা কুরআনের উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

সেই সাথে আমরা এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছি যে দিন পৃথিবীর বুক থেকে অশান্তির দুষ্টক্ষত অভিশপ্ত ইহুদী জাতি চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তাদের দোসর মুশরিকরাও। মানবতার কল্যাণ ও মুক্তির জন্য মুসলিমদের বিজয় অনিবার্য। ইতিহাস সাক্ষী একমাত্র মুসলমানদের রাজত্বে ও স্বর্ণযুগেই দিকে দিকে শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হয়েছে, অন্যদের রাজত্বে নয়। বর্তমান পরাশক্তি আমেরিকা ও পূর্ব যুগের পরাশক্তি রোম, পারস্য, ফেরাউন, জেঙ্গিস খান, বখত নাসার, নমরুদ গোষ্ঠী মানব জাতিকে শুধু বর্বরতা, অশান্তি, অত্যাচার আর পাশবিকতাই উপহার দিয়েছে। সে যুগের ফেরাউনের পাশবিক নির্যাতন আর এ যুগের ইরাকের আবু গারিব কারাগার কিংবা কিউবার গুয়ানতানামো বে এর পাশবিক নির্যাতন সে সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ। মুসলমানদের শাসনামলে এমন অত্যাচারের প্রমাণ কেউ দিতে পারবে না। নিজেরা অভুক্ত থেকেও মুসলমানরা বন্দীদেরকে খাবার দিয়েছে। হযরত উমর (রাঃ) এর শাসনামলে মুসলমানরা ইউরোপ আফ্রিকার দেশগুলো যখন একে একে জয় করে চলেছে, তখন বিজিত দেশের অধিবাসীরা মুসলমানদেরকে শান্তি ও মুক্তির দূত হিসেবে বরণ করে নিয়েছে। তদানীন্তন বিশ্বের সবচাইতে ক্ষমতাধর ব্যক্তি হযরত উমর (রাঃ) এর গায়ে তখন ১২ টি তালিযুক্ত পোশাক। ইতিহাস সাক্ষী!

হযরত উমার (রাঃ) এর নির্দেশে যখন মিশরের গভর্ণর আবু উবাইদাহ তার লোকবল নিয়ে মিশর ছেড়ে আসেন তখন মিশরবাসীদের জিজিয়া কর (tax) তাদের তালিকা ধরে ধরে ফিরিয়ে দেন। কী বিরাট মহানুভবতা! একি মানুষ না ফেরেশতার কাজ! তৎকালীন মিশরবাসী অমুসলিমরা অশ্রুসিক্ত নয়নে মুসলমানদের বিদায় দেয়।

মানবতার সেই সুদিন আবার ফিরে আসবে। মুসলমান আবার বিশ্বের বুকে বিজয়ী হবে। তবে এজন্য ঘুমন্ত সিংহকে জাগাতে হবে। তাদের চেতনা জাগ্রত করতে হবে। ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। তবেই মুসলিম জাতি আবার তাদের হারানো গৌরব ফিরে পাবে। কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়ঃ

দিকে দিকে পূনঃ জাগিয়ে উঠিছে
দ্বীন ইসলামী লাল মশাল
ওরে বেখবর তুইও ওঠ জেগে
তুইও তোর প্রাণ প্রদীপ জ্বাল।

সুতরাং কুরআনে বর্ণিত এই ভবিষ্যদ্বাণী হাজার হাজার বছর ধরে সত্য হয়ে রয়েছে, এতে সন্দেহ নেই।

# ভবিষ্যদ্বাণী - নয়

## মিল্লাতের ইতিহাসে পঞ্চম পর্যায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত প্রচুর হাদীস মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে। তার একটি উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হল ঃ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের দ্বীনের সূচনা নবুওয়াত ও রাহমাত থেকে। আল্লাহ যতদিন চাইবেন একে অক্ষুন্ন রাখবেন। তারপর নবুওয়াতের অনুসরনে খেলাফত চলবে যতদিন তিনি চাইবেন। আল্লাহর ইচ্ছায় এটারও অবসান হবে। তারপর শুরু হবে রাজতন্ত্র। তারপর অত্যাচারী শাসকদের শাসন কায়েম হবে। যতদিন আল্লাহ চাইবেন ততদিন তা চলবে। তারপর আল্লাহ তাআলা তার অবসান ঘটাবেন। অতঃপর নবুওয়াতের পদ্ধতির সেই খেলাফত ও প্রতিষ্ঠিত হবে-যা মানুষের মধ্যে নবীর সুন্নত অনুযায়ী আমল করবে এবং জমীনে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে। এ শাসন ব্যবস্থায় আসমানবাসীও খুশি হবে এবং দুনিয়াবাসীও। আসমান প্রাণ খুলে তার বরকত সমূহ বর্ষণ করতে থাকবে এবং জমীন তার গর্ভস্থ সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে। (সিরাতে সরওয়াবে আলম)

উক্ত হাদীসে মিল্লাতের (মুসলিম জাতির) পাঁচটি পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। এর তিনটি পর্যায় সঠিকভাবে অতীত হয়েছে । প্রথম পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নেতৃত্বে নবুওয়াতের ভিত্তিতে খেলাফত পরিচালিত হয়েছিল ১০ বছর- অর্থাৎ ৬২২খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। রাসূলুল্লাহ (সা) এর ইন্তিকালের পর ইসলামী খেলাফতের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় খুলাফায়ে রাশেদার নেতৃত্বে। তাঁরা নবুওয়াতের অনুসরনে পরিপূর্ণ ইসলামী খেলাফত পরিচালনা করেন ৩০ বছর। এর পর তৃতীয় পর্যায়-এ শুরু হয় রাজতন্ত্র। বর্তমানে চতুর্থ পর্যায় চলছে। অত্যাচারী শাসকদের যুলুমতন্ত্র। অবশেষে পঞ্চম পর্যায়ে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা অবশ্যই সত্য হবে। আমরা তা দেখার অপেক্ষায় আছি।

# ভবিষ্যদ্বাণী - দশ
## মুসলমানগণ অমুসলিমদের কাছে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হবে

ছাওবান (রাঃ) বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,"অদূর ভবিষ্যতে অন্য জাতির লোকেরা তোমাদের উপর বিজয়ী হবে, যেমন ক্ষুধার্ত লোকেরা সমবেতভাবে বড় পাত্রের দিকে এগিয়ে আসে"। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, আমাদের সংখ্যা কি তখন কম হবে? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "না, বরং সে সময় তোমরা সংখ্যায় অনেক হবে। কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে সমুদ্রের ফেনার মত, আল্লাহ তখন তোমাদের শত্রুদের অন্তর হতে তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দূর করে দিবেন এবং তোমাদের অন্তরে অলসতা সৃষ্টি করে দিবেন। " তখন জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, " ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ), অলসতার সৃষ্টি কেন হবে ? তিনি বললেন, " দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং মৃত্যু ভয়ের জন্য।" (আবু দাউদ- ৪২৪৭, কিতাবুল মালাহিম; বায়হাকী)

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ছাওবান (রাঃ) কে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি,"হে ছাওবান! যখন অন্য জাতির লোকেরা তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য একে অন্যকে আহ্বান করবে , যেমন করে লোকেরা একই পাত্রের কাছে আসার জন্য ও সেখান থেকে খাওয়ার জন্য একে অন্যকে আহ্বান করে, তখন তুমি কি করবে ?" ছাওবান (রাঃ) বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। এটা কি এ জন্য যে, আমরা সংখ্যায় কম হব ? নবী (সাঃ) বললেন, " না , সেদিন তোমরা সংখ্যায় হবে অনেক, কিন্তু আল্লাহ সে সময় তোমাদের অন্তরে দুর্বলতা সৃষ্টি করে দিবেন"। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে দুর্বলতাটি কি? তিনি (সাঃ) বললেন, " এটি হল - এই দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং যুদ্ধ করতে অপছন্দ করা"। (আহমাদ-২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৯)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা যখন বেচাকেনা করবে, গাভীর লেজ ধরে থাকবে, চাষাবাদে লেগে যাবে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তখন তোমাদের ওপর অপমান চাপিয়ে দিবেন এবং তা তোমরা হটাতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমারা নিজেদের দীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করো"। (আহমাদ; আবু দাউদ; হাকেম)

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে সময়ে (সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে) এই ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করেছিলেন সে সময়ে বিষয়টি ছিল কল্পনাতীত। মুসলিম জাতি তখন উদীয়মান শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম ও মুসলিম জাতি তখন অপ্রতিরোধ্য। মিথ্যা ও অন্ধকারের পাহাড় ভেদ করে সত্যের আলোর জয় জয়াকার। সত্য সমাগত, অসত্য বিতাড়িত আর মিথ্যা তো বিতাড়িত হবেই।

বহুদিন ধরে পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য ছিল বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত পরাশক্তি। তাদের ও তাদের অনুগতদের পাশবিক শাসনে শোষণে মানবতা নিষ্পেষিত ও ভুলুণ্ঠিত হচ্ছিল।

মহামুক্তির মহানায়ক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পরাশক্তিদ্বয়ের করাল গ্রাস থেকে নির্যাতিত মানবতাকে মুক্ত করে আনলেন। উক্ত দুই পরাশক্তিকে চিরতরে ধ্বংস করে দিলেন। পূর্বেই ঘোষণা দিয়ে বললেন, "কেসরা ধ্বংস হবে এর পর আর কোন কেসরার জন্ম হবে না।" সপ্তদশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাস হল মুসলমানদের জয়জয়াকারের ইতিহাস। শৌর্য-বীর্যে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে মুসলিমরা গোটা বিশ্বের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল । মুসলিম জাতির মত এরূপ নিরঙ্কুশ ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা ও কর্তৃত্ব আর কোন জাতি কখনো অর্জন করতে পারেনি। ইতিহাস সাক্ষী, এ কৃতিত্ব একমাত্র মুসলিম জাতির।

১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে খ্রিস্টান শক্তির কাছে মুসলমানগণ পরাজয় বরণ করে। আর তখন থেকেই শুরু হয় এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হওয়ার পালা–যা ছিল মুসলিম জাতির জন্য চরম বেদনাদায়ক। এ অবস্থা চলতে থাকবে মুসলিম জাতি বিশ্বের বুকে পুনরায় বিজয়ী হবার পূর্ব পর্যন্ত। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যা বলেছেন তা কখনও ভ্রান্তি হয়নি, ভ্রান্তি হবেও না কখনো।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এখন মুসলিম জাতিকে চরম লাঞ্ছনায় ও নির্যাতনে নিষ্পেষিত হতে হচ্ছে। শত শত বছর ধরে মুসলিম জাতি অমুসলিমদের হাতে কত যে নির্যাতিত হয়েছে তা বর্ণনাতীত। কেবল বিগত দুই দশকে অমুসলিমদের হাতে যত সংখ্যক অসহায় মুসলিম নারী পুরুষ নির্যাতিত ও নিহত হয়েছে তার শত ভাগের একভাগ অসহায় অমুসলিমও কখনো মুসলিমদের হাতে নির্যাতিত হয়নি। বিগত কয়েক দশকে বিশ্ব ব্যাপী মুসলিম নির্যাতনের কিছু বর্ণনা এখানে দেয়া হলঃ

১৯৯২-৯৫ পর্যন্ত বসনিয়ার খ্রিস্টানদের দ্বারা দুই লক্ষাধিক মুসলিম নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়। আট লক্ষাধিক মুসলমানকে পুরোপুরি বা আংশিক পঙ্গুত্ব বরণ করতে হয়। লক্ষাধিক মুসলিম বালিকা ও নারীকে পরিকল্পিতভাবে ধর্ষণ করা হয়। প্রায় ৮০০ মসজিদ ধ্বংস করা হয়। বিশ্বের প্রায় ১৫০ কোটি মুসলমান তখন 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি' পাঠ ছাড়া আর কি করতে পেরেছে ? ভারতের গুজরাটে, আহমেদাবাদে নিরপেক্ষ সূত্র মতে এ পর্যন্ত দুই লক্ষাধিক মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে। যাদের বেশির ভাগকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ধ্বংস করা হয়েছে ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ সহ ১৮৩ টি মসজিদ এবং ২৪০ টির মতো দরগাহ।

মধ্যপ্রাচ্যের ফিলিস্তিনে মুসলমানদের উপর ইহুদী অপশক্তির অব্যহত নিষ্ঠুর নির্যাতন অর্ধশতাব্দীর অধিক কাল ধরে বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করছে।

'News week' লিখেছে, চেচনিয়াতে ১৯৪৪ সালে রুশ নেতা স্টালিন ৫ লক্ষেরও বেশি চেচেন মুসলিম নাগরিককে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করে। তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়।

গত দশকে রাশিয়ান বাহিনী প্রায় ১ লক্ষ চেচেন মুসলমানকে হত্যা করে। ২ লক্ষ লোককে নির্বাসিত করে এবং দেশটির প্রায় এক চুতর্থাংশকে পরিবেশগত ডাস্টবিনে পরিণত করে। (News Week, 11 Nov.02, Page-13)

আফগানিস্তান ইরাক, চীন, ফিলিপাইন, কাশ্মীর সহ বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই আজ মুসলমানদের উপর খ্রিস্টান মুশরিক পশুশক্তির করাল গ্রাস। মুসলমানদের মান সম্মান, সহায় সম্পদ সবই পশু নখরে ছিন্নভিন্ন। তাদের আর্তনাদ আর হাহাকারে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত। যে পবিত্র ভূমিতে আমাদের প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ (সা:) প্রথম ইসলামের পথযাত্রা শুরু করেছিলেন সেই পূণ্যভূমি মক্কা মদীনায় আজ নাপাক শক্তির অশুভ পদচারণা।

ইসলাম ও মুসলমানদের উপর অমুসলিম জাতির বিজয় ও কর্তৃত্বের কারণ কি ? উল্লেখিত তিনটি হাদীসে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা:) কারণ বলে দিয়েছেন। হাদীসগুলো আমাদের গুরুত্ব দিয়ে পাঠ করা উচিত। ভেবে দেখা দরাকার এখন কি মুসলামানদের উপর সেই ক্রান্তিকাল চলছে না যার ভবিষ্যদ্বাণী আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে আমাদের নবীজী (সা:) ব্যক্ত করেছিলেন ?

যে মুসলিম জাতির অঙ্গুলি হেলনে অপর সব জাতিকে একদা উঠতে বসতে হতো সেই শাসকের জাতি আজ অন্যান্য জাতির খেলার পুতুলে পরিণত হয়েছে। সাহাবীদের যুগে তাদের জন্য মুসলিম জাতির এ করুণ চিত্র কল্পনাতীত ছিল । কারণ মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক সাহাবী যেভাবে অপ্রতিরোধ্য গতিতে বিশ্ব জয় করে চলেছেন সে সময়ে তাঁরা কিভাবে মুসলিম জাতির এ করুণ অবস্থার কথা চিন্তা করতে পারেন। তাই তারা নবীজীকে জিজ্ঞাসা করেছেন, " মুসলমানদের এ অবস্থা তাদের সংখ্যাল্পতার করণে হবে কি?"

এ জিজ্ঞাসার জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর প্রকৃত কারণ উপরোক্ত হাদীস তিনটিতে বর্ণনা করেছেন এবং এ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় বলে দিয়েছেন।

বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উপরোক্ত হাদীসগুলোতে বর্ণিত অবস্থার সাথে বর্তামানে মুসলমানদের অবস্থা হুবহু মিলে যাচ্ছে। এবং এতটা মিল এর আগে কখনো হয়েছে বলে মনে হয় না। বর্তমানে মুসলমানদের স্বভাব-চরিত্র এবং তাদের সামগ্রিক দুরবস্থার চিত্র উল্লিখিত হাদীসগুলোর আলোকে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার।

অমুসলিম সমর বিশেষজ্ঞরা পর্যন্ত মুসলমানদের পরাজয়ের পেছনে কারণ বর্ণনায় নিজেদের অজান্তে নবী (সা:) এর কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন।

Lawrence D. Higgins নামক একজন মার্কিন বিশেষজ্ঞ তার উসমানীয় সাম্রাজ্য সম্পর্কিত এক লেখায় Military decline of Ottoman Empire শিরোনামে লিখেছেন " Under the first ten Sultans, the Ottoman Turkeys had been an aggressive military power, open to technological innovation and improvement... the elite of the Ottoman army dominated the battlefield. Turkish general were the equal of the best Austrian, Spanish and French Commanders. The Sultan himself commanded his armies in the field.

By 1650 Turkish Weapons were outmoded. Within the ... corps, corruption and nepotism were rife. Instead of seeking battle, the janissaries sought comfort, wealth and political influence. Not only did they occasionally make and unmake sultans, they also blocked all attempts to reform and modernize the army. At the very time the Austrian and Russian military strength increased, Turkish military strength declined ... " (- Brassey's Encyclopedia of military History and Biography, (Edited by- Frankin D. Margiotta, 1994, P#752)

বস্তুত দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা, যুদ্ধের প্রতি অনীহা এবং মৃত্যু ভয় আমদেরকে বাহ্যিকভাবে করেছে অলস ও কাপুরুষ, আর আধ্যাত্মিকভাবে আমাদেরকে করেছে অসুস্থ। অসুস্থ ব্যক্তির যেমন পুষ্টিকর ও উন্নত খাবারের প্রতি থাকে অনীহা, তেমনই আমাদের অন্তরে ইবাদতের কষ্ট সহ্য করা বা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা এবং কিতাল (সশস্ত্র সংগ্রাম) করার মত সুউচ্চ মর্যাদা দানকারী, প্রভাব-প্রতিপত্তি দানকারী, শক্তিদায়ী আমলের প্রতিও রয়েছে সীমাহীন অনীহা। অন্তর অসুস্থ হবার কারণে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে গিয়েছি যার কারণে আজ আমারা অনাচার, অবিচার ও জুলুম-নির্যাতনের প্রতিরোধ করা তো দূরের কথা প্রতিবাদ করতেও ভয় পাই । আমাদের অবস্থা হয়েছে অথর্ব-পঙ্গু লোকদের মত। ফলাফল তো হাদীস তিন টিতেই উল্লেখ আছে। আমাদের ঈমানের আজ এমনই দুরবস্থা যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কথা যা - অবিশ্বাস করা কুফরি, যার সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করা কুফরি- তাতেও ঠিকমত ভরসা করতে পারি না।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,"১২ হাজার সদস্যের বাহিনী কখনও সংখ্যাল্পতার কারণে পরাজিত হতে পারেনা " । (তিরমিজি, আবু দাউদ; আহমাদ)

আমরা ভুলে গেছি, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ, "তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করবে যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ করে থাকে। এবং জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীনদের সাথে আছন"। (আত-তওবাঃ ৩৬)

এখন মুত্তাকী কাকে বলে? সাধারণভাবে মুত্তাকী বলতে আমরা খোদাভীরু বা পরহেজগার অর্থই বুঝে থাকি। কিন্তু তার স্পষ্ট ধারণা হয়ত আমাদের অনেকেরই নেই। মুত্তাকী বলতে সে সকল লোকদেরকেই বুঝায় যারা আল্লাহর ভয়ে এবং তাঁর সন্তুষ্টির আশায় তাঁর যাবতীয় আদেশ ও নির্দেশ রাসূলুল্লাহ (সা:) এর প্রদর্শিত পথ ও পদ্ধতি অনুসারে মেনে চলেন। এ হিসেবে, আয়াতে নির্দেশ হলো, 'সর্বাত্মক ভাবে যুদ্ধ করার'- আল্লাহ্র এ নির্দেশটিকে যদি আমরা পালন না করি, তাহলে আমারা মুত্তাকী হতে পারব কি? আর মুত্তাকী না হলে উল্লেখিত আয়াত অনুসারে আল্লাহ কি আমাদের সাথে থাকবেন ?

মুসলমান যে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় এ কথা ধ্রুব সত্য। সেই সাথে একথাও সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে কখনো লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন না। তাহলে আমরা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আজ নানা ভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত কেন হচ্ছি ? তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের মুসলমান হাবার দাবীতে কোথাও আজ গলদ আছে। যদিও আমাদের নাম সরকারি দপ্তরে মুসলমান হিসেবে লিখিত আছে, কিন্তু সেই সরকারি দপ্তরের সার্টিফিকেট অনুসারে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় না । আল্লাহ তা'আলার নিজস্ব দপ্তর রয়েছে- তা আমাদের সরকারি দপ্তর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দপ্তরে আমাদের নাম তাঁর অনুগত বান্দাদের তালিকায় লিখিত আছে না কি অবাধ্য বান্দাদের তালিকায় লিখিত আছে - তা একবার আমাদের খোঁজ করে দেখা দরকার।

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (সা:) এর মারফত আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন পথের দিশা, শিখিয়েছেন মুসলমান হবার উপায় ও নিয়ম-কানুন। জানিয়ে দিয়েছেন আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের সম্মান-প্রভাব -প্রতিপত্তি লাভ করার পথ ও পদ্ধতি। যে কাজ মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে, আল্লাহ তাআলা নবী (সা:) মারফত তার সবই আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা বর্তমানের মসুলমান হিসেবে দাবিদাররা কি কখনো আল্লাহ প্রদত্ত পথের দিশা থেকে পথ পেতে চেষ্টা করছি? আমরা কি মুসলমান হবার উপায়-উপকরণ ও নিয়ম-কানুন জেনে নিয়ে তা আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের ক্ষেত্রে চর্চা এবং বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করছি ? আখিরাতে সম্মান- প্রভাব- প্রতিপত্তি ও সাফল্য লাভ করার পথ ও পদ্ধতিকে কি অনুসরণ করছি ? যে সব কাজ মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে সে সব কাজ কি আমরা ত্যাগ করেছি ? দুনিয়াতে আজ আমরা মুসুলমান হিসেবে দাবী করা সত্ত্বেও যেভাবে অপমানিত ও অপদস্থ হচ্ছি, যে ফল ভোগ করছি - পরকালেও কি আমরা সে রকম অপমানিত ও অপদস্থ হব না? আমাদের এই বর্তমান মুসলমানিত্ব আমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে কি ?

আমাদের আরো চিন্তা করা উচিত যে, আমরা কেন আজ আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হচ্ছি ? কেন আজ চারদিক হতে আমাদের উপর এ বিপদ-রাশি এসে পড়ছে? কেন আজ আল্লাহর অবাধ্য বান্দা হিসেবে আমরা যাদেরকে মনে করি, তারা সকল ক্ষেত্রে আমাদের উপর বিজয়ী ?

মিরদাস অসলামী (রা:) বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: "নেককার লোকেরা ক্রমান্বয়ে মৃত্যুবরণ করবেন। আর বাকী লোকেরা যব অথবা খেজুরের আহারের অনুপযোগী অংশ হিসেবে বেঁচে থাকবে। আল্লাহ তাআলা এদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবেন না।" (বুখারী, কিতাবুদ দোয়া)

প্রিয় নবী (সা:) দুষ্কর্মীদেরকে যবের ভূষি ও খেজুরের আহারের অনুপযোগী অংশের সাথে তুলনা করে অপদার্থ রূপে ঘোষণা করলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে, এ অপদার্থের কি হলো, তারা কোথায় ধ্বংস হলো, কার কাছে পরাজিত-নির্যাতিত হলো এব্যাপারে আল্লাহ তাআলার কোন পরোয়া নেই'- আমরা কি বর্তমানে এ অবস্থার মুখোমুখি নই?

# ভবিষ্যদ্বাণী - এগার
## মুশরিক কুরাইশরা বেশি দিন টিকে থাকবে না

**"এ ভূখন্ড থেকে তোমাকে উৎখাত করে এখান থেকে বহিষ্কার করার জন্যে তারা বদ্ধপরিকর হয়েছিল। কিন্তু যদি তারা এরূপ করে তাহলে তোমার পরে স্বয়ং তারা এখানে বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে না"**। (সূরা বানী ইসরাইল ঃ ৭৬)

এ সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত আয়াতগুলো যখন অবতীর্ণ হয় তখন তা বাস্তব রূপ লাভ করার কোন আলামতই দেখা যাচ্ছিল না; কিন্তু দশ বছরের মধ্যে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়। মুষ্টিমেয় ইমানদারদের উপর কুরাইশদের অত্যাচার তখন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। অত্যাচার, নির্যাতনের কারণে অনেককেই হিযরত করতে হয়েছে। এ সূরা নাজিল হবার এক বছর পর নবী (সঃ) কে তারা মক্কা থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করে। বের করে দিয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি। নবী (সাঃ) ও তাঁর আন্দোলনকে চিরতরে নির্মূল করার জন্য সমগ্র আরবের মুশরিকরা জোটবদ্ধ হয়ে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এতদসত্বেও তাদের সকল আয়োজন ব্যর্থ হয়। মক্কা থেকে চলে যাবার পর আট বছরকাল অতিবাহিত না হতেই নবী (সাঃ) বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন। তারপর দু'বছরের মধ্যেই সমস্ত আরব ভূখণ্ড থেকে মুশরিকদের অস্তিত বিলুপ্ত হয়। যারাই তখন সেখানে অবস্থান করছিল মুসলিম হিসেবেই করছিল। মুশরিকদের কোন স্থানই সেখানে ছিল না।

# ভবিষ্যদ্বাণী - বার
## পরিপূর্ণ নিরাপত্তার যুগ আসবে

হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কাবা ঘরের ছায়ায় বসেছিলেন। আমি তাঁর কাছে হাজির হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ), জুলুম অত্যাচারের আর অন্ত নেই। আপনি কি আল্লাহর দরবারে দোয়া করছেন না?

এ কথা শুনে তাঁর চেহারা মোবারক রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বে যাঁরা ঈমানদার ছিলেন তাঁদের উপর এর চেয়ে ঢের বেশি নির্যাতন হয়েছে। লোহার চিরুনী দিয়ে তাদের শরীরের মাংস ছিন্ন ভিন্ন করা হতো, তাদের মাথার উপর করাত রেখে চিরে ফেলা হতো, তথাপি তারা সত্য দ্বীন থেকে সরে পড়েনি। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ এ কাজ সম্পন্ন করেই ছাড়বেন। এমন এক সময় আসবে যখন এক ব্যক্তি সানআ' থেকে হাজরামাউত পর্যন্ত নির্ভয়ে সফর করবে এবং আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে তার ভয় করার থাকবে না। কিন্তু তোমরা বড্ডো তাড়াহুড়ো করছো।-(বুখারী)

পরবর্তীকালের ইতিহাস সবার জানা আছে। ইসলামের স্বর্ণযুগ এমন একটি শান্তি ও নিরাপত্তার সমাজ উপহার দিয়েছিল যার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। অন্ধকার যুগের অবসান ঘটিয়ে ইসলামের সোনালী যুগের আবির্ভাবের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়।

ইসলামের স্বর্ণ যুগে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার কিছু দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা হলঃ

### 'আইনের চোখে সবাই সমান'

হজ্জ করবার সময় ভিড়ের মধ্যে আরবের পার্শ্ববর্তী এক রাজার চাদর এক দাসের পায়ে জড়িয়ে যায়। বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা 'জাবালা' সেই দাসের গালে চড় বসিয়ে দিলেন। লোকটি খলীফা উমারের (রা:) নিকট সুবিচার প্রার্থনা করে নালিশ করে। জাবালাকে তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠানো হলো। অভিযোগ সত্য কিনা জিজ্ঞাসা করায় জাবালা রূঢ় ভাষায় উত্তর দিলেন, "অভিযোগ সত্য"। এই লোকটি আমার চাদর মাড়িয়ে যায় কাবা ঘরের চত্বরে।

"কিন্তু কাজটি তার ইচ্ছাকৃত নয়, ঘটনাক্রমে হয়ে গেছে"- রুক্ষ স্বরে বাধা দিয়ে বললেন খলীফা। উদ্ধত ভাবে জাবালা বললেন," তাতে কিছু আসে যায় না-এ মাসটা যদি পবিত্র হজ্জের মাস না হতো তবে আমি লোকটিকে মেরেই ফেলতাম।" জাবালা ছিলেন ইসলামী সাম্রাজ্যের একজন শক্তিশালী মিত্র ও খলীফার ব্যক্তিগত বন্ধু।

খলীফা কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর অতি শান্ত ও দৃঢ় স্বরে বললেন, " জাবালা, তুমি তোমার দোষ স্বীকার করেছ। ফরিয়াদী যদি তোমাকে ক্ষমা না করে তবে আইনানুসারে চড়ের পরিবর্তে সে তোমাকে চড় লাগাবে।"

গর্বিত সুরে উত্তর দিলেন জাবালা, "কিন্তু আমি যে রাজা আর ও যে একজন দাস।" উত্তরে উমার (রা:) বললেন, "তোমরা দু'জনেই মুসলমান এবং আল্লাহর চোখে দু'জনই সমান।" গর্বিত রাজার অহংকার চূর্ণ হয়ে গেল।

## মূর্তির নাকের বদলে মানুষের নাক

একদিন আলেক জান্দ্রিয়ার খ্রিস্টান পল্লীতে হৈ চৈ পড়ে গেল। কে একজন গত রাত্রে যীশু খ্রিস্টের প্রস্তর নির্মিত প্রতিমূর্তির নাক ভেঙ্গে ফেলেছে। খ্রিস্টানরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। ধরে নিল তারা যে, এটা একজন মুসলমানেরই কাজ। খ্রিস্টান নেতারা মুসলিম সেনাপতি আমর ইবনুল আস এর কাছে এলো বিচার ও অন্যায় কাজের প্রতিশোধ দাবি করতে। আমর সব শুনলেন। শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তিনি প্রতিমূর্তিটি সম্পূর্ণ নতুন করে তৈরি করে দিতে চাইলেন। কিন্তু খ্রিস্টান নেতাদের প্রতিশোধ নেবার বাসনা ছিল অন্য রূপ। তাদের সংকল্প প্রকাশ করে একজন খ্রিস্টান নেতা বললো, " যীশু খ্রিস্টকে আমারা আল্লাহর পুত্র বলে মনে করি। তাঁর প্রতিমূর্তির এরূপ অপমান হওয়াতে আমরা অত্যন্ত আঘাত পেয়েছি। অর্থ এর যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ নয়। আমরা চাই আপনাদের নবী মুহাম্মাদের প্রতিমূর্তি তৈরি করে ঠিক অমনি ভাবে তার অসম্মান করি।" এ কথা শুনে বারুদের মত জ্বলে উঠলেন আমর ইবনুল আস। ভীষণ ক্রোধে মুখমন্ডল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ নীরব থেকে নিজেকে সংযত করে নিয়ে তিনি খ্রিস্টান বিশপকে লক্ষ্য করে বললেন," আমার অনুরোধ, এ প্রস্তাব ছাড়া অন্য যে কোন একজনের নাক কেটে আমি আপনাদের দিতে প্রস্তুত, যার নাক আপনারা চান।" খ্রিস্টান নেতারাও সকলেই এ প্রস্তাবে সম্মত হলো। পরদিন খ্রিস্টান ও মুসলমান বিরাট এক ময়দানে জমায়েত হলো। মিসরের শাসক সেনাপতি আমর ইবনুল আস (রা:) সবার সামনে হাজির হয়ে বিশপকে বললেন," এদেশ শাসনের দায়িত্ব আমার। যে অপমান আজ আপনাদের তাতে আমার শাসন দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে। তাই তরবারি গ্রহণ করুণ এবং আপনিই আমার নাসিকা ছেদন করুন।"

এ কথা বলেই তিনি বিশপকে একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারি হাতে দিলেন। জনতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, খ্রিস্টানরা স্তম্ভিত। চারদিকে থম থমে ভাব। সে নীরবতায় নিঃশ্বাসের শব্দ করতেও যেন ভয় হয়। সহসা সেই নীরবতা ভঙ্গ করে একজন মুসলিম সৈন্য এলো। চিৎকার করে বলল, "আমিই দোষী-- আমাদের মহামান্য আমীরের কোন অপরাধ নেই। আমিই মূর্তির নাসিকা কর্তন করেছি, এই তো আমার হাতেই আছে!" সৈন্যটি এগিয়ে এসে বিশপের তরবারির নীচে নিজের নাসিকা

পেতে দিল। স্তম্ভিত বিশপ। নির্বাক সকলে। বিশপের অন্তরাত্মা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তরবারি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিশপ বললেন, "ধন্য সেনাপতি, ধন্য এই বীর সৈনিক, আর ধন্য আপনাদের মুহাম্মাদ (সঃ) যাঁর মহান আদর্শে আপনাদের মত মহৎ, উদার, নির্ভীক ও শক্তিমান ব্যক্তি গড়ে উঠেছে। যীশু খ্রিস্টের প্রতিমূর্তির অসম্মান করা অন্যায় হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চাইতেও অন্যায় হবে যদি আজ আমি এই সুন্দর ও জীবন্ত দেহের অঙ্গহানি করি। সেই মহান ও আদর্শ নবীকেও আমার সালাম জানাই।"

# ভবিষ্যদ্বাণী - তের

## বাইতুল্লাহর এই চাবি এক সময় আমার হাতেই দেখবে

ইসলাম-পূর্বকালেও কাবা ঘরের সেবাকে এক বিশেষ মর্যাদার কাজ মনে করা হত। এ কাজের জন্য যারা নির্বাচিত হত তারা গোটা সমাজ তথা জাতির মাঝে সম্মানিত ও বিশিষ্ট বলে পরিগণিত হতো। জাহেলিয়াতের আমল থেকেই হজ্জের মৌসুমে পানি পান করানোর দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল মহানবী (সাঃ) এর চাচা আব্বাস (রাঃ) এর উপর। একে বলা হত 'সেকায়া'। এমনি করে অন্যান্য আরও কিছু সেবার দায়িত্ব হুজুর (সাঃ) এর অন্য চাচা আবু তালেবের উপর এবং কাবা ঘরের চাবি কাছে রাখা এবং যথাসময়ে তা খুলে দেয়া ও বন্ধ করার ভার ছিল ওসমান ইবনে তালহার উপর।

এ ব্যাপারে স্বয়ং ওসমান ইবনে তালহার ভাষ্য হল এই যে, জাহিলিয়াতের যুগে আমরা সোমবার ও বৃহস্পতিবার কাবা ঘরের দরজা খুলে দিতাম এবং মানুষ তাতে প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করত। হিযরতের পূর্বে একবার মহানবী (সাঃ) কয়েকজন সাহাবীসহ কাবা ঘরে প্রবেশের উদ্দেশ্যে তশরীফ আনেন। ওসমান ইবনে তালহা তাঁকে ভেতরে প্রবেশে বাধা দিলেন এবং অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করলেন। মহানবী (সাঃ) অত্যন্ত ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য সহকারে ওসমানের কটূক্তিসমূহ সহ্য করে নিলেন।

অতঃপর বললেন, হে ওসমান! হয়তো তুমি এক সময় এই চাবি আমার হাতেই দেখতে পাবে। তখন যাকে ইচ্ছা এই চাবি অর্পণ করার অধিকার আমারই থাকবে। ওসমান ইবনে তালহা বলল, যদি তাই হয়, তবে সেদিন কুরাইশরা অপমানিত, অপদস্থ হয়ে পড়বে। হুজুর (সাঃ) বললনে, না, তা নয়। বরং তখন কুরাইশরা স্বাধীন হবে, তারা হবে যথার্থ সম্মানে সম্মানিত। এ কথা বলতে বলতে তিনি বাইতুল্লাহর ভিতরে তশরীফ নিয়ে গেলেন। (ওসমান বলেন,) অতঃপর আমি যখন আমার মনের ভেতর অনুসন্ধান করলাম তখন আমার যেন নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গেল যে, তিনি যা কিছু

বললেন, তা অবশ্যই ঘটবে। সে মুহূর্তেই আমি মুসলমান হয়ে যাবার সংকল্প নিয়ে নিলাম। কিন্তু আমি আমার সম্প্রদায়ের কঠোর মনোভাবের কারণে সংকল্প বাস্তবায়িত করতে পারলাম না।

অতঃপর মক্কা বিজিত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে ডেকে বাইতুল্লাহর চাবি চাইলেন। আমি তা সবিনয়ে পেশ করে দিলাম।

কোন কোন বর্ণনায় আছে, মক্কা বিজিত হলে ওসমান ইবনে তালহা চাবি নিয়ে বাইতুল্লাহর উপরে উঠে গেলেন। তখন হযরত আলী (রাঃ) মহানবী (সাঃ) এর নির্দেশ পালনকল্পে তার নিকট থেকে জোরপূর্বক চাবি ছিনিয়ে নিয়ে হুজুর (সাঃ) এর হাতে অর্পণ করলেন। যাহোক, বাইতুল্লায় প্রবেশ এবং সেখানে নামাজ আদায়ের পর মহানবী (সাঃ) যখন বাইরে বেরিয়ে এলেন তখন পুনরায় সে চাবি আমার হাতেই ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, এই নাও, এখন থেকে এ চাবি কেয়ামত পর্যন্ত তোমার বংশধরদের হাতেই থাকবে। অন্য যে কেউ তোমাদের হাত থেকে এ চাবি ফিরিয়ে নিতে চাইবে সে হবে জালেম, অত্যাচারী।

ওসমান ইবনে তালহা বলনে, যখন আমি চাবি নিয়ে হৃষ্টচিত্তে চলে আসছিলাম তখন হুজুর (সাঃ) আমাকে ডাকলেন। বললেন, ওসমান! আমি যা বলেছিলাম তাই হল নাকি? তৎক্ষনাৎ আমার সে কথাটি মনে হয়ে গেল হিযরতের পূর্বে যা তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, "হয়তো এ চাবি একদিন আমার হাতেই দেখতে পাবে।" তখন আমি নিবেদন করলাম, নিঃসন্দেহে আপনার কথা বাস্তবায়িত হয়েছে। আর তখনি আমি কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলাম। (তাফসীরে মারিফুল কুরআন)।

# ভবিষ্যদ্বাণী - চৌদ্দ

## রাসূল (সাঃ) এর স্মরণ ও সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে

**আল্লাহ তাআলা বলেন, এবং তোমার জন্য তোমার জিকেরের আওয়াজ বুলন্দ করে দিয়েছি।"** (সূরা ইনশিরাহ : ৪)

এ আয়াতটি এমন এক সময় অবতীর্ণ হয়েছিল যখন কেউ একথা চিন্তাই করতে পারত না যে, যে ব্যক্তির সাথে মাত্র গুটি কয়েক লোক রয়েছে এবং মক্কা নগরীতেই যারা সীমাবদ্ধ, সে ব্যক্তির আওয়াজ কিভাবে সমগ্র দুনিয়ায় বুলন্দ হতে পারে এবং কেমন করে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে পারে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বড় সাহেবজাদা ছিলেন কাসেম (রাঃ)। তাঁর ছোট হযরত যয়নাব (রাঃ), তাঁর ছোট হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) অতঃপর তিন মেয়ে হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ) হযরত ফাতেমা (রাঃ) এবং

হযরত রুকাইয়া (রাঃ)। এঁদের মধ্যে হযরত কাসেম (রাঃ) এবং পরে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ইন্তেকাল করেন। এ কথা শুনে কুরাইশ নেতা আস ইবনে ওয়াইল বলে, তাঁর বংশ খতম হয়ে গেল। এখন তিনি 'আবতার' বা ছিন্নমূল। তাঁর কোন পুত্র সন্তান নেই যে, তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবে। মৃত্যুর পর তাঁর নাম দুনিয়া থেকে মুছে যাবে। তখন তোমরা তাঁর থেকে নিস্কৃতি লাভ করবে। হুজুর (সাঃ) এর পুত্র শোকের সময় তাঁর চাচা আবু লাহাব, আবু জেহেল এবং আরও অনেকে এ ধরণের হীন মানসিকতার পরিচয় দেয়। নবুওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে নবী করীম (সাঃ) চরম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। গোটা জাতি তাঁকে নির্মূল করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। তাঁর মুষ্টিমেয় সঙ্গী সাথীদের সাফল্যের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ অবস্থায় তাঁর নবীকে (সাঃ) এ সুসংবাদ দিলেন এবং আশ্চর্যজনকভাবে তা বাস্তবায়িত করলেন।

নবীর (সাঃ) স্মরণ বা আওয়াজ ঘরে ঘরে পৌঁছানোর কাজ তিনি স্বয়ং নবীর দুশমনদের দ্বারাই শুরু করলেন। মক্কার কাফেরগণ নবী (সাঃ) কে বিপদে ফেলার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করেছিল তার মধ্যে একটা ছিল এই যে, হজ্জের সময় যখন গোটা আরবের লোক মক্কায় পৌঁছাতো, তখন কাফেরদের এক একটি প্রতিনিধি দল হাজীদের শিবিরে শিবিরে হাজির হতো। তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলতো, মুহাম্মদ নামে একটি মারাত্মক লোক মানুষের ওপর এমন এমন যাদু করছে। পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে। অতএব তার থেকে সাবধান হয়ে থাকবে। এ ধরণের প্রচারণা তারা ঐসব লোকের কাছেও করতো যারা হজ্জ ছাড়াও জিয়ারত বা কোন ব্যবসা উপলক্ষে মক্কায় আসতো। এভাবে যদিও তারা নবীপাক (সাঃ) এর কুৎসা রটনা করতো যেন তাঁর দ্বীনের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়তে না পারে। কিন্তু তার ফল এই হলো যে, আরবের গ্রামে-গঞ্জে অতি সহজেই তাঁর নাম পৌঁছে যায়। এভাবে দুশমনেরা তাঁর নাম মক্কার নিভৃত স্থান থেকে সারা দেশের সকল গোত্রের কাছে পরিচিত করে তোলে। তারপর স্বাভাবিকভাবেই লোকে জানতে চাইলো, সে লোকটি কে, কি বলে, কেমন লোক সে, কারা তার যাদুর দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে এবং যাদুর কোন ধরণের প্রতিক্রিয়া তাদের উপর পড়ছে।

মক্কার কাফেরদের প্রচারণা যতই বাড়েত থাকলো, মানুষের মনে এসব জিজ্ঞাসাও বেড়ে চললো। এ জিজ্ঞাসা ও ঔৎসুক্যের ফলে নবীপাক (সাঃ) এর চরিত্র ও আচার-আচরণ লোকে জানতে পারলো। তারা কুরআন শুনার সুযোগ পেল এবং নবীপাকের (সাঃ) শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারলো। তারা লক্ষ্য করলো যে, যে জিনিসকে জাদু বলা হচ্ছে তার প্রভাবে সাধারণ আরববাসীদের জীবন ধারায় অসাধারণ পরিবর্তণ সূচিত হচ্ছে। এর ফলে নবীর কুৎসা তাঁর সুনাম সুখ্যাতিতে পরিণত হতে লাগলো। তারপর হিজরতের পূর্বেই অবস্থা এমন হল যে, দূর ও নিকট আরব গোত্রগুলোর এমন একটাও ছিল না যার মধ্যে কেউ না কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং যাদের মধ্যে কিছু লোক

নবী (সাঃ) ও তাঁর দাওয়াতের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েনি। এ হচ্ছে হুজুর (সাঃ) এর চর্চা বুলন্দ হওয়ার প্রথম পর্যায়।

অতঃপর হিজরতের পর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। এ সময় একদিকে মুনাফিক দল, ইহুদী এবং সমগ্র আরবের মুশরিকরা নবী (সাঃ) এর বিরোধিতায় উঠেপড়ে লেগেছিল। অপরদিকে মদীনার নবীর ইসলামী রাষ্ট্র আল্লাহভীতি, চারিত্রিক পবিত্রতা, সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা, ন্যায়পরায়ণতা, সাম্য, ধনীদের উদার হস্তে দান, গরীবদের তত্ত্বাবধান, চুক্তির সংরক্ষণ, লেনদেন ও কায়-কারবারের সততা প্রভৃতির এমন অনুপম উপমা পেশ করছিল যা মানুষের হৃদয় জয় করে চলছিল। নবী (সাঃ) এর নেতৃত্বে ঈমানদারদের এমন একটি সমাজ ও জামায়াত তৈরি হয়েছিল যে, তারা তাদের নিয়ম শৃঙ্খলা, বীরত্ব, দুনিয়ার জীবন ও মৃত্যুর প্রতি উপেক্ষা, যুদ্ধের মধ্যেও চারিত্রিক সীমারেখা রক্ষার মাধ্যমে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব এমনভাবে প্রমাণ করেন যে, সমগ্র আরব তাদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। দশ বছরের মধ্যে হুজুর (সাঃ) এর চর্চা ও মহিমা এতটা বুলন্দ হলো যে, বিরোধীরা যে দেশে তাঁকে বদনাম করার জন্য সর্ব শক্তি নিয়োগ করেছিল, সে দেশের সর্বত্র আকাশ-বাতাস মুখরিত করে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বাণী গুঞ্জরিত হতে থাকলো।

অতঃপর তৃতীয় পর্যায় শুরু হল খেলাফতে রাশেদার যুগ থেকে; যখন নবী (সাঃ) এর নাম সারা দুনিয়ায় বুলন্দ হতে লাগলো। এর ধারাবাহিকতা আজ পর্যন্ত বেড়েই চলছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বেড়েই চলবে। আজ দুনিয়ায় এমন কোন স্থান নেই যেখানে মুসলমানদের কোন বসতি নেই এবং দিনে পাঁচাবার আযানের মাধ্যমে উচ্চ স্বরে, মুহাম্মাদ (সাঃ) এর রিসালাতের ঘোষণা করা হয় না, নামাযের মধ্যে নবীর (সঃ) প্রতি দরূদ পড়া হয় না এবং জুমুয়ার খুতবার মধ্যে তাঁকে স্মরণ করে মঙ্গল কামনা করা হয় না। বছরের বার মাসের মধ্যে কোন দিন এবং দিনের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এমন কোন সময় নেই-যখন দুনিয়ার কোথাও না কোথাও নবীপাক (সাঃ) এর মোবারক জিকর হয় না।

ব্যক্তিগতভাবেও প্রত্যেক মুসলমান সারা জীবনে লক্ষ-কোটিবার নবী (সাঃ) এর প্রতি দরুদ পড়ে থাকে। এমন কোন দিন যায় না যেদিন তার মুখ থেকে নবী (সাঃ) এর মঙ্গল কামনায় সালাম প্রেরণ করা হয় না। বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমানের মুখে প্রত্যহ কোটি কোটি বার তাঁর মোবারক নাম উচ্চারিত হচ্ছে। হাজার বছর ধরে এ নাম মর্যাদার সাথে উচ্চারিত হচ্ছে এবং হতে থাকবে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন আরেকজনকে খুঁজে পাওয়া যাবে না যার নাম এভাবে স্মরণ করা হয়।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী (সাঃ) বলেছেন, জিব্রাঈল আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার এবং আপনার রব জিজ্ঞেস করেন, কিভাবে তিনি আপনার নাম ও জিকর বুলন্দ করেন। নবী (সাঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলাই তা ভাল

জানেন। জিব্রাইল বলেন, আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন, যখন আমার জিকর করা হয় তখন আমার সাথে তোমার (নবীর) নাম জিকর করা হবে।

পরবর্তীকালের গোটা ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে।

# ভবিষ্যদ্বাণী - পনের
## কুরাইশদের হাতে শাসন ক্ষমতা থাকবে

**আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "ভালমন্দ সব অবস্থায় কুরাইশগণ কিয়ামত পর্যন্ত জনগণের নেতৃত্ব দিবে।" (তিরমিযী)**

অপর এক বর্ণনায় রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে, যতদিন কুরাইশগণ তাদের চরিত্র উন্নত রাখবে এবং সামগ্রিকভাবে দ্বীনের ধ্বজা বহন করতে থাকবে আর তাদের মধ্যে যদি দু'জন লোকও সত্যের জন্য সংগ্রামশীল পাওয়া যায়, তাহলে শাসন ক্ষমতা তাদের হাতে থাকবে।

নবী (সাঃ) এর একথা এতটা সত্য ছিল যে, তার পরে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ইতিহাস তার সত্যতার প্রমাণ পেশ করতে থাকে। কুরাইশ গোত্রের শ্রেষ্ঠত্ব এমন ছিল যে, খেলাফতে রাশেদার যুগে চারজন খলিফা, এ গোত্রই সরবরাহ করে। তাদের বিকল্প কোন নেতৃত্ব সারা আরবে তখন ছিল না। অতঃপর এ গোত্রই প্রসিদ্ধ উমাইয়া শাসন কায়েম করে। এ গোত্রই আব্বাসিয় শাসনের পত্তন করে। স্পেনে বিরাট মুসলিম শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং মিশরে ফাতেমীয় শাসন প্রতিষ্ঠা এ গোত্রেরই অবদান।

# ভবিষ্যদ্বাণী - ষোল
## উয়াইস করনী আসবে

উমার (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছিঃ ইয়ামেনের সাহায্যকারী দলের সাথে উয়াইস ইবনে আমের নামক এক ব্যক্তি তোমাদের কাছে আসবে। সে মুদার গোত্রের উপগোত্র 'করণ' বংশের লোক। তার কুষ্ঠরোগ হবে এবং

তা থেকে সে মুক্তি পাবে, শুধু এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা ব্যতীত। তার মা জীবিত আছে এবং সে তার খুবই অনুগত। সে (আল্লাহব্ব উপর ভরসা করে) কোন কিছুর শপথ করলে আল্লাহ তা পূরণ করে দেন। যদি তুমি তোমার অপরাধ ক্ষমার জন্য তাকে দিয়ে দোয়া করানোর সুযোগ পাও তবে তাই করবে। (মুসলিম)

সাইয়েদুত তাবিঈ হযরত উয়াইস ইবনে আমের করনী সম্পর্কে মুসলিম শরীফে আরও কিছু হাদীসের বর্ণনা রয়েছে। হযরত উমার (রাঃ) এবং উসাইর ইবনে আমর (রাঃ) থেকে সেগুলো বর্ণিত হয়েছে। যার সার সংক্ষেপ হলোঃ

ইয়ামেন থেকে উয়াইস নামে এক উত্তম লোক মদীনায় আসেব। সে অত্যন্ত বুজর্গ লোক। তার কুষ্ঠ রোগ হবে। আল্লাহর কাছে রোগমুক্তির দোয়া করলে আল্লাহর তাঁর রোগমুক্তি দান করবেন। তবে এক দিরহাম পরিমাণ স্থানে তার চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। তাঁর সুপারিশে রবী গোত্র ও মুদার গোত্রের সম সংখক লোক জান্নাতে যাবে।

হযরত উয়াইস করনী রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগ পেয়েও তাঁর সাথে দেখা করতে পারেননি। তিনি তাঁর মায়ের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। বৃদ্ধা মায়ের সেবাযত্নের কারণে তাকে একাকী ফেলে এসে রাসুলূল্লাহর (সাঃ) সাথে সাক্ষাত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এজন্য তাকে সাহাবীদের মধ্যে গণ্য না করে তাবেঈদের মধ্যে গণ্য করা হয়।

হযরত উয়াইস করনী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বক্তব্য শোনার পর হযরত উমার (রাঃ) তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় থাকতেন। ইয়ামেন থেকে যখনই কোন সাহায্যকারী সেনাদল আসত তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করতেন, "তোমাদের মধ্যে উয়াইস ইবনে আমের নামে কেউ আছে কি?" সাধারণত তাঁর সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারতো না। কারণ ইয়ামেনে তিনি কোন সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন না।

তবুও রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি লক্ষ্য রেখে হযরত উমার (রাঃ) ইয়ামেন থেকে আগত প্রতিনিধি দলগুলোতে উয়াইস করনীর অনুসন্ধান অব্যহত রাখেন। পরবর্তীতে কেউ কেউ উয়াইস সম্পর্কে বলতে পারলেও তাঁর সম্পর্কে মুসলিম জাহানের খলিফা হযরত উমার (রাঃ) এর এত আগ্রহ দেখে তারা বিস্মিত হতো। তারা বলত, উয়াইসকে আমরা অতি সাধারণ লোক হিসেবেই জানি, তাঁকে তো কোন গুরুত্বপূর্ণ লোক মনে করি না।

অবশেষে একদিন কোন এক প্রতিনিধি দলের সাথে হযরত উয়াইস করনী এসে গেলেন। হযরত উমার (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাত হলে তিনি (উমার) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি মুদার গোত্রের উপগোত্র 'করনের' লোক? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, আপনার কি কুষ্ঠরোগ হয়েছিল-তা থেকে সুস্থ হয়েছেন এবং মাত্র এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা অবশিষ্ট আছে? তিনি বলেন, হ্যাঁ। উমার (রাঃ) বলেন, আপনার মা কি বেঁচে আছেন? উয়াইস উত্তর দিলেন, হ্যাঁ।

অতঃপর হযরত উমার (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছিঃ ইয়ামেনের সাহায্যকারী দলের সাথে উয়াইস ইবনে আমের নামে এক ব্যক্তি তোমাদের

কাছে আসবে। যে পরবর্তীদের (তাবিঈদের) মধ্যে একজন উত্তম লোক হবে। সে কোন কিছুর শপথ করলে আল্লাহ তা পূরণ করে দেন। যদি তুমি তাকে দিয়ে তোমার গুণাহ ক্ষমার জন্য দোয়া করাবার সুযোগ পাও তবে তাই করবে। উমার (রাঃ) বলেন, কাজেই আপনি আমার ক্ষমার জন্য দোয়া করুন। অতএব তিনি উমারের (রাঃ) জন্য ক্ষমা চেয়ে দোয়া করলেন।

উমার (রাঃ) তাঁকে বললেন, আপনি কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা রাখেন? তিনি বললেন, 'কুফা' । উমার (রাঃ) বললেন, সেখানকার গর্ভণরকে আপনার সাহায্যের জন্য লিখে দেই? তিনি বললেন, গরীব মিসকিনদের মাঝে বাস করাই আমার কাছে অধিক প্রিয়।

পরবর্তী বছর কুফার এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হজ্জে এলে হযরত উমার (রাঃ) উয়াইস সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, তাঁকে আমি এমন অবস্থায় দেখে এসেছি যে, তাঁর ঘরটা অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় রয়েছে এবং তার জীবনোপকরণ খুবই নগণ্য। হযরত উমার (রাঃ) তাকে উয়াইস সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীস বর্ণনা করলেন। লোকটি কুফায় ফিরে এসে উয়াইস করনীর সাথে সাক্ষাত করে বলল, আপনি আমার গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করুন। তিনি বললেন, আপনি এইমাত্র কল্যাণময় সফর (হজ্জ) থেকে ফিরে এসেছেন, বরং আপনিই আমার জন্য দোয়া করুন। অতপর জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি হযরত উমার (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাত করেছেন? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তখন হযরত উয়াইস তার জন্য দোয়া করলেন।

লোকদের মাঝে উয়াইসের মর্যাদা সম্পর্কে জানাজানি হয়ে যায়। সবাই তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হলে তিনি সেখান থেকে অনত্র চলে যান।

উয়াইস করনীর মাতৃভক্তি ও বুজর্গী সম্পর্কে লোকমুখে নানা কথা প্রচলিত আছে। কিন্তু অনেকেরই জানা নাই যে, তিনি জিহাদের ময়দানে আল্লাহর রাহে জীবন দিয়ে শহীদ হয়ে যান।

# ভবিষ্যদ্বাণী - সতের
# মুসলমানগণ পূর্ববর্তীদের (ইহুদী ও খৃস্টানদের) রীতি-নীতি অনুসরণ করবে

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ। তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি-নীতি অবলম্বন করবে।" (তিরমিযী)

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মুসলমানগণ ইহুদী খৃস্টানদের এমনভাবে অনুসরণ করবে যে, তারা যা করত মুসলমানগণ হুবহু তাই করবে। এমনকি

তারা নিজ মায়ের সাথে জিনা করে থাকলেও মুসলমানদের মধ্যেও কেউ কেউ তাই করবে।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী আজ ভয়ঙ্কর রূপে সত্যে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে সাধারণভাবে বিশ্বের মুসলমানদের অবস্থা এই হয়েছে যে, তারা ইসলামের শাশ্বত বিধি-বিধানকে বাদ দিয়ে ইহুদী খ্রিস্টানদের রীতি-নীতি অনুসরণ অনুকরণ করাকে সম্মান ও গৌরবের বিষয় বলে মনে করে। ইহুদী-খ্রিস্টান-মুশরিকদের সংস্কৃতি, চালচলন, সামাজিক রীতি-নীতি, রাজনৈতিক মতাদর্শ, আইন ও বিচার ব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, পোশক-আশাক এমনকি হেয়ার স্টাইলও (মেয়েদের চুল ছোট রাখা, ছেলেদের বড় রাখা, গোফ বড় রাখা, দাড়ি মুণ্ডন করা ইত্যাদি) আজকের মুসলমানরা অনুসরণ অনুকরণ করছে। অথচ ইসলাম হলো পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা (Complete code of life). অন্যদের রীতি-নীতি অনুকরণ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। শুধু তাই নয়, অন্যদের রীতি-নীতির বিরুদ্ধাচরণ করাই হল রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নত।

পক্ষান্তরে পরিপূর্ণ ইসলামী বিধি বিধানের অনুসরণ করাকে এক শ্রেণীর মুসলমান সেকেলে ধ্যান-ধারণা ও সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয় বলে বিশ্বাস করে। কেউ কেউ আরও এক ধাপ এগিয়ে ইসলামের বিধি বিধান পরিত্যাগ করাকে আধুনিকতা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা বলে মনে করে। অথচ ইসলাম হল পরিপূর্ণ ও সর্বাধুনিক ধর্ম ও জীবন বিধান। ইসলাম ছাড়া আর সব ধর্ম ও মতাদর্শ বাতিল ও ব্যাক ডেটেড। আল কুরআন হল ঐশী গ্রন্থ সমূহের মধ্যে সর্বশেষ সংস্করণ। কুরআন ছাড়া বাইবেল, তাওরাত বা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের আদর্শ অনুসরণ করা মুসলমানদের জন্য বৈধ নয়, সম্পূর্ণ হারাম।

ইসলামই একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ইসলাম ছাড়া আর কোন পরিপূর্ণ জীবন বিধান বা মতাদর্শ আছে বলে কেউ দাবিও করে না-যাতে মানবজীবনের সকল সমস্যা সমাধানের দিকনির্দেশনা রয়েছে। যেমন- কমিউনিজামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধান (যদিও তা ব্যর্থ) থাকলেও পারিবারিক সামাজিক, নৈতিক, মনস্তাত্বিক ইত্যাদি বিষয়গুলোর কোন দিক নিদের্শনা এতে নেই। আবার হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মীয় বিধানের মধ্য নৈতিক ও ধর্মীয় কিছু বিষয় থাকলেও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা আন্তর্জাতিক বিষয়ের কোন দিক নির্দেশনা নেই। এসব বিষয়ের জন্য অন্যান্য মতাদর্শের দারস্থ হতে হয়।

সুতরাং ইসলামের সংস্কৃতির মত এত বলিষ্ঠ, কল্যাণকর এবং প্রভাবী সংস্কৃতি আর কোথাও নাই। হিন্দু ধর্মের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজার কথাই ধরা যাক। প্রতি বছর শরৎ কালে এ উপমহাদেমের হিন্দু সমাজ এই দুর্গোৎসব পালন করে থাকে। মনের মাধুরী মিশিয়ে, ভক্তিভার দুর্গাদেবীর প্রতিমা তৈরি করা হয়। ভক্তিগদগদ চিত্তে দূর্গাদেবীর পুজা-অর্চনা করা হয়। আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়ে বেশ কটা দিন কাটানো

হয়। অবশেষে বিজয়া দশমীর দিনে মহাসমারোহে প্রতিমা বির্সজনের মধ্য দিয়ে এই উৎসবের সমাপন হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিনীত শ্রদ্ধা রেখেই জিজ্ঞাসা করি, এতে কার কি লাভ হয়? এতে দুঃখী মানুষের কী কল্যাণ হয়?

অপরদিকে ইসলামের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার কথাই চিন্তা করুন। যাকাত-ফিতরার মাধ্যমে গরীবদের প্রতি ধনীদের অর্থ সাহায্য বাধ্যতামূলক করার কারণে প্রতি বছর অনন্ত একটি দিন ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল মানুষের জীবন হাসি আনন্দে ভরে ওঠে। যে সকল গরীব-দুঃখীর ভাগ্যে কখনো এক টুকরো গোশত কিনে খাবার সুযোগ হয় না তারাও এই দিনে মনভরে পেটপুরে গোশত খাওয়ার সুযোগ পায়। এমন একজন মুসলমানও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার এমন বিধান, এমন সংস্কৃতি আর কি কোথাও আছে? একেই বলে আল্লাহর বিধান। এর চেয়ে উত্তম বিধান আর হতে পারে না।

ইসলামের প্রত্যেকটি ইবাদত তথা নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদির মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত উপকার। এগুলো অন্যান্য ধর্মের মত অনুষ্ঠান সর্বস্ব ইবাদত নয়। এ সব ইবাদতের মধ্যে মানবতার জন্য এত কল্যাণকর বিষয় রয়েছে যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ নামাজের কথাই ধরা যাক। নামাজ ইসলামের পাঁচটি মৌলিক ইবাদতের (স্তম্ভের) অন্যতম । নামাজের উপকার ও কল্যাণের কথা বর্ণনা করতে গেলে একটি সতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেও শেষ করা যাবে না। তবু অতি সংক্ষেপে নামজের কয়েকটি উপকারের কথা উল্লেখ করা হল ঃ

১. স্বাস্থ্যবিধি ঃ নামাজ শরীর ও মনকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। এটি সর্বোত্তম যোগ ব্যায়াম । দাঁড়ানো, রুকু করা, সেজদা করায় অতি উত্তমভাবে রক্ত সঞ্চালন হয়।

২. পরিচ্ছন্নতা ঃ নামাজের পূর্বে অজু করা নামাজের পূর্বশর্ত (ফরজ)। দিনে পাঁচবার অজুর মাধ্যমে শরীরের ধুলো ময়লা দূর হয় ও রোগ জীবানু থেকে মুক্ত থাকা যায়। এজন্য যারা নিয়মিত নামাজ পড়ে তাদের রোগ বালাই তুলানামূলকভাবে অনেক কম।

৩. মেডিটেশন ঃ দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে সর্বোত্তমরূপে মেডিটেশন চর্চা হয়। নামাজের মধ্যে দুনিয়ার সকল চিন্তা ভাবনা, কাজকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা বাধ্যতামূলক। এজন্য নামাজের চেয়ে উত্তম মেডিটেশন আর হয়না। নিয়মিত যথাযথভাবে নামাজ পড়লে নামাজের যোগ ব্যায়াম, মেডিটেশন, পবিত্রতা , আধ্যাত্মিকতার কারণে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হার্ট এটাকের মত অনেক কঠিন রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

৪. পবিত্রতা ঃ নামাজ মনকে পবিত্র ও রুচিশীল করে। নামাজের স্থান, শরীর ও পোশাক পবিত্র হওয়া নামাজের পূর্বশর্ত। এছাড়া রুচিশীল পোশাক পরা, সুগন্ধি ব্যবহার করা নামাজের জন্য উত্তম কাজ।

৫. শৃংখলা ঃ নামাজ সর্বোত্তম শৃংখলা শিক্ষা দেয়। লক্ষ লক্ষ লোক কোন আধুনিক ব্যবস্থাপনা ছাড়াই অত্যন্ত সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে এক সাথে নামাজ আদায় করতে পারে। নামাজের মধ্যে সমস্ত কাজ ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করতে হয়। একজন ইমামের নেতৃত্বের অনুসরণের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ লোক এক সাথে রুকু, সেজদা, কিয়াম করে সুচারুরূপে নামাজ পড়ে। কোন বিশৃংখলতার লেশমাত্র থাকে না। নামাজের মধ্যে নেতৃত্বের অনুসরণের এই শিক্ষা সমাজ জীবনে প্রয়োগ করলে সমাজ থেকেও সমস্ত বিশৃংখলতা দূর হয়ে যাবে । নামাজ হল একটি সুন্দর সুশৃংখল সমাজের মডেল ।

৬. সময়ানুবর্তিতা ঃ প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদায় করা ফরজ (অবশ্য কর্তব্য)। সূর্য ওঠার এক মিনিট পরে ফজরের নামাজের সময় থাকে না। একইভাবে সূর্য অস্ত যাবার এক মিনিট পূর্বেও মাগরিবের নামাজ পড়া যায় না। নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিন পাঁচবার নামাজের জামাতে হাজির হয়ে যে সময়ানুবর্তিতার অভ্যাস গড়ে উঠে তা অন্যকোন ভাবে সম্ভব নয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল আজ মুসলমানরাই সময়ের ব্যাপারে সবচেয়ে উদাসীন কারণ এরা নামাজের ব্যাপারে উদাসীন।

৭. সাম্যবাদ ঃ নামাজ থেকে সাম্যবাদের প্রকৃত শিক্ষা পাওয়া যায়। ধনী - গরীব, বাদশা- ফকির সবাই এক জামাতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মসজিদে নামাজ আদায় করে । কোন হিংসা-বিদ্বেষ, ভেদাভেদ থাকে না। সেখানে কেউ ছোট কেউ বড় নয়। সবার জন্য সমান অধিকার।

৮. আনুগত্য ঃ নামাজ নেতার প্রতি সঠিক আনুগত্যের শিক্ষা দেয়। একটি সমাজ, রাষ্ট্র, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠভাবে চালাতে হলে একজন কর্তা বা নেতার এবং তার প্রতি সঠিক আনুগত্য অপরিহার্য । নামাজের জামাতে ইমামের প্রতি যে ভাবে আনুগত্য করা হয় তা থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় নেতৃত্বের প্রতি কোন্ অবস্থায় কতখানি আনুগত্য করতে হবে, কোন অবস্থায় আনুগত্য করা যাবে না ।

৯. নামাজের সবচেয়ে বড় উপকারিতা হল ঃ "নিশ্চয়ই নামায অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে"। সমাজে নামায প্রতিষ্ঠিত থাকলে অন্যায়, অশ্লীলতা থেকে নামায মানুষকে কিভাবে বিরত রাখে তা পুরোপুরি উপলব্ধি করা সম্ভব নয় । কারণ বিষয়টি একই সাথে জাগতিক এবং অধ্যাত্মিক (Spiritual) .

এ ছাড়াও নামাজের বহুবিধ উপকার সম্পর্কে লিখতে হলে একটি সতন্ত্র বই লিখেও শেষ করা যাবে না। নামাজের মত রোজা, হজ্জ, যাকাতের মধ্যেও রয়েছে বহুবিধ উপকার ও শিক্ষা ।

অনর্থক, অকল্যাণকর কোন ইবাদত ইসলামে নেই। ইসলামে এমন কোন একটি ইবাদতও নেই যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। অথচ দেখুন সতীদাহ প্রথার মত এমন মর্মন্তুদ ও অমানবিক প্রথা ধর্মীয় প্রথা হিসাবেই পালন করা হতো। সৌভাগ্য যে, এই

প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে। অথচ ইসলামের কোন প্রথা বিলুপ্ত হবার নয়। ইসলামের কোন প্রথার নাই কোন প্রয়োজন সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিমার্জনের।

ইসলামের বিধিবিধান তথা ইসলামের সংস্কৃতি এত অনুপম ও শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও এর অনুসরণ করতে খোদ মুসলমানদের মধ্যেই কেন এত হীনমন্যতা, এত অনীহা ? এমন অনেক মুসলমান আছে যারা ইসলামের বিধি-বিধান অনুসরণ তো দূরের কথা নিজেকে মুসলিম পরিচয় দিতেও স্বচ্ছন্দ বোধ করে না।

এমনতর স্ববিরোধিতা ও আত্মপ্রবঞ্চনার উদাহরণ কেবল মুসলিম জাতির মধ্যেই দেখা যায়। আর কোন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সাধারণত এমনটা হয় না। তাদের মধ্যে কেউ নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করে না। তসলীমা নাসরীন, আহমদ শরীফ, দাউদ হায়দার, হালের হুমায়ুন আজাদরা অন্যান্য ধর্মে জন্ম নেয় না। এদের জন্ম হয় শুধু মুসলমানদের মধ্যে।

একদিন বিটিভেতে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে এক বিশেষ অনুষ্ঠান হতে দেখলাম। অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন রথীন্দ্রনাথ রায় এবং সুবীর নন্দীর মত স্বনামধন্য কণ্ঠশিল্পীবৃন্দ। তাঁদের কোন দ্বিধা নেই, হীনমন্যতা নেই তাদের ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে। অথচ অনেক মুসলমান শিল্পীর মধ্যে এই হীনমন্যতা কাজ করে। তাদেরকে কোন ইসলামি অনুষ্ঠানে বা পর্বে অংশগ্রহণ করতে কখনোই দেখা যায় না। অনেক প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী আছেন যাঁরা কখনো কোন ইসলামি গানে কণ্ঠ দেন না। এমন কি ইসলামি নজরুল সংগীতের মত প্রাচুর্যময় সংগীতেও কণ্ঠ দেন না। এর একমাত্র কারণ হল নিজ ধর্ম ইসলামের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার একবার একটি ইসলামি কবিতা' আবৃত্তির অডিও ক্যাসেট বের করে। শফি কামাল , কাজী আরিফের মত প্রখ্যাত আবৃত্তিকার এতে কবিতা আবৃত্তি করেছেন। এদেশের একজন প্রখ্যাত আবৃত্তিশিল্পী ও অভিনেতার নিকট ক্যাসেটটিতে কণ্ঠ দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ ধর্ণা দিয়েছিলেন। তিনি রাজী হন নি। একমাত্র কারণ ইসলামি কবিতা। অবশ্য ইসলামি কবিতা না হয়ে অন্য ধর্ম বিষয়ক কবিতা হয় তাতে কণ্ঠ দিতে এদের আপত্তি থাকে না।

স্বধর্মের প্রতি মুসলমানদের কেন এই মনোভাব? কেন এই হীনমন্যতা? অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে তো এরূপ মনোভাব নাই। তারা তাদের ধর্মীয় বিষয়গুলো ভাল হোক মন্দ হোক , মনে প্রাণে নির্দ্বিধায় মেনে নেয়। একে এরা প্রগতি ও আধুনিকতার অন্তরায় বলে মনে করে না। এমনটি বরং হওয়া উচিত ছিল মুসলমানদের মধ্যে । কারণ ইসলামে কোন অন্ধ বিশ্বাস নেই , কুসংস্কার নেই।নেই কোন অবান্তর, অকল্যাণকর বিধিবিধান। ইসলাম সর্বাধুনিক ও সর্বশেষ ধর্ম । আল কুরআন ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বশেষ সংস্করণ।

মধ্যযুগ ছিল মুসলমানদের স্বর্ণযুগ। আর একারণেই এরা মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা, মধ্যযুগীয় বরবর্তা, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি স্লোগান আবিষ্কার করে তৃপ্তি পায়। আর তৃপ্তি পায় ভিন্ন কৃষ্টি-কালচার ও সংস্কৃতির অনুসরণে।

এদের প্রতি আল কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সুস্পষ্ট ঘোষণাঃ "তবে কি তোমরা ইসলাম ছাড়া আর কোন মতবাদের অনুসরণ করতে চাও? অথচ আসমান-জমীনে যা কিছু আছে–ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক সব কিছুই ইসলামের অনুসরণ করতে বাধ্য"। (সূরা ইমরান, আয়াত ঃ ৮৩) এ জন্যই বোধ করি সারা জীবন ইসলামের রীতিনীতি স্বেচ্ছায় অনুসরণ না করলেও এদের মৃত্যু পরবর্তী সকল কার্যক্রম ইসলামের সংস্কৃতি অনুসারেই সাধিত হয়। এদের জানাযা, কাফন, দাফন, কুলখানিসহ সকল আচার অনুষ্ঠানে ইসলামের সংস্কৃতিই অনুসৃত হয়। কবরে শেষ শয্যায় রাখার সময় এদের আপন জনেরা উচ্চারণ করে, "বিসমিল্লাহি আলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহি" অর্থাৎ আল্লাহর নামে ও রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর মিল্লাতের উপর। যদিও এদের জীবন কেটেছে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর আদর্শের বিরোধিতা করে। এই হাস্যকর মানসিকতা, স্ববিরোধিতা ও আত্মপ্রবঞ্চনার অবসান কবে হবে?

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ"।

সুতরাং সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর আদর্শের চেয়ে উত্তম আদর্শ আর হতে পারে না। তাঁর আদর্শ বাদ দিয়ে যারা আমুকের আদর্শ তমুকের আদর্শ বা অন্য জাতির আদর্শ ও রীতিনীতি অনুসরণ করতে চায় তার চেয়ে বোকা আর হতভাগা আর কেউ হতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ (সা:) ছিলেন এমন একজন অনন্য সাধারণ মহাপুরুষ যাঁর পবিত্র শরীর মোবারকে কখনো দুর্গন্ধ হতো না, সর্বদা সুরভিত থাকতো । কেউ তাঁর (সা:) পবিত্র হাতের সাথে হাত মেলালে (করমর্দন করলে) সারা দিন তার হাত সুবাসিত থাকতো। রাসূলুল্লাহ (সা:) এর গায়ের ঘাম মোবারক ছিল মুক্তোর দানার মত উজ্জ্বল ও সুভ্র সুরভিত। অনেক সাহাবী তাঁর গায়ের ঘাম সংগ্রহ করে রাখতেন এবং সুগন্ধি (perfume) হিসেবে ব্যবহার করতেন। তাঁর পায়খানা প্রস্রাবেও দুর্গন্ধ থাকতো না এবং মাটিতে পড়লে মাটি তা গ্রাস করে নিত।

প্রখর রোদে পথ চলতে থাকলে মেঘেরা এসে তাঁকে ছায়া দিয়ে চলতো। কখনো ফেরেশতা এসে ছায়া দিত। গাছের শাখা নুইয়ে এসে তাঁকে অভিবাদন জানাতো। যে পথ দিয়ে তিনি চলে যেতেন সে পথ দিয়ে অন্য লোকেরা চলতে গিয়ে বুঝতে পারতো যে, এ পথ দিয়ে নবীজী (সা:) চলে গেছেন। সে পথের বাতাস স্নিগ্ধ সুরভীতে ভরে যেত। নবীজীর (সা:) শরীর মোবারকে কখনো মশা-মাছি বসতো না।

ডঃ কাজী দ্বীন মুহাম্মাদ বলেন, "মানব ইতিহাসের সবচেয়ে স্মরণীয় ও প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিদের এক এক জন এক এক দিকে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করেছেন। প্রত্যেকের জীবনে একটি আদর্শের প্রতিফলন দেখা যায়। কেউ ছিলেন দয়ার সাগর, কেউ আমিত তেজ সাহসী বীর, কেউবা রজনীতিবিদ, আর কেউ চিন্ত

াবিদ, কেউ সরলতার প্রতীক, আবার কেউবা শ্রেষ্ঠ বিনয়ী। মনীষী সক্রেটিস, এরিস্টটল প্রমুখ ছিলেন আদর্শ দার্শনিক । মহামতি আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ান এঁরা ছিলেন আদর্শ বীর। এ যুগে এসে পাই মাও সেতুং, মোহন লাল করমচাঁদ গান্ধীকে, আরো পাই লেলিন , স্ট্যালিন, মার্কস এমনকি বার্ট্রান্ড রাসেল, বার্নাড শ সবাই যে যার ক্ষেত্রে প্রতিভার স্ফূরণ ঘটিয়েছেন। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা:) -এর চরিত্রে এ সকল গুণের একত্রে সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি মানবীয় সকল বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন। সমগ্র মানুষের (Mankind as a whole) সম্পূর্ণ মনুষত্যের বিকাশ সাধনই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য । তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন রশ্মিরাজি চারদিকে বিকশিত হয়েছিল।

মহানবী (সা:) ছিলেন আদর্শ মানব। জীবনের সকল সময়ে সকল মানুষের জন্য তিনি সকল অবস্থায় আদর্শ হতে পারেন। অনাথ-ইয়াতীমদের আদর্শ আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর শৈশব মাতৃস্নেহ বঞ্চিত শিশুর আদর্শ, তায়েফের ভাগ্যবতী ধাত্রী হালিমা সাদিয়ার ঘরে বালক মুস্তাফা। ধনীদের আদর্শ সফল ব্যবসায়ী আর বয়ঃকালে বাহরাইনের মালিক বাদশাহ মুহাম্মাদ (সা:) -এর জীবন; সর্বহারা নির্যাতিতের আদর্শ আবু তালিবের গিরি গুহায় নির্বাসিত দীর্ঘদিনের জন্য বন্দী মুহাম্মদ (সা:) । বিজয়ী বীরের আদর্শ বদর আর হুনায়নের সেনাপতি মুহাম্মাদ (সা:), বিজিতদের আদর্শ ওহুদের যুদ্ধে আহত মুহম্মদ (সা:) ।

শিক্ষকের আদর্শ মদীনার মসজিদ আর আহলে সুফ্‌ফার শিক্ষকের বরণীয় জীবন। ছাত্রের আদর্শ হেরা গুহায় জিবরাঈলের নিকট শিক্ষার্থী সাধক; আদর্শ বাগ্মীর আদর্শ দশ বছর মদীনার মসজিদে খুৎবা দান ও আরাফাত ময়দানে বিদায় হজ্জের ভাষণ দানরত মুহাম্মাদ (সা:) । আল্লাহর পথে সহায় সম্বলহীন সংগ্রাম ও সাধনারত মহামানবের আদর্শ মক্কায় তেরো বছরের নবীজীবন। পরাজিত দুশমনের প্রতি বিজয়ী বীরের আদর্শ মক্কা বিজয়ী মুহাম্মদ (সা:) ।

আদর্শ সাংসারিক মহামানব খায়বার, ফিদাক, বনি নাজার গোত্রের ভূসম্পত্তির মালিক মুহাম্মদ (সা:) । আরব মরুর মেষ চালক সংযত চরিত্র আহমাদ আল আমীনের বরণীয় জীবনী সারা বিশ্বের যুব সমাজের আদর্শ। ব্যবসায় পণ্য কাঁধে কুরায়েশ কাফেলার সাথী, সিরিয়াগামী সওদাগর মুহাম্মাদ (সা;) কর্মী ব্যবসায়ী ও তরুণ সমাজের সম্মুখে আদর্শের আলোক স্তম্ভ।

মহানবী (সা:) এর চরিত্রের আরো একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেক মহাপুরুষের কর্মজীবন সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। আর মহানবী (সা:) এর কর্ম মানবজীবনের সর্ব ক্ষেত্রে প্রসারিত। সাম্রাজ্য জয় এবং পাপ ও কুসংস্কার থেকে রক্ষা করা যদি মহাপুরুষের লক্ষণ হয়, তবে হযরত মুহাম্মাদ (সা:) এর জুড়ি এ পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যাবেনা"।

এজন্য আমাদেরকে অন্যান্য সকল মতাদর্শ, সকল ইজম বা সংস্কৃতি বর্জন করে ইসলামের সুমহান ও শ্বাশ্বত বিধানের দিকে ফিরে আসতে হবে। করতে হবে পরিপূর্ণ অনুসরণ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমার রেখে যাওয়া দুটি জিনিস যতদিন মুসলমানগণ আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন তারা অপদস্থ হবে না। সে দুটি জিনিস হলঃ আল্লাহর কুরআন ও রাসুল (সাঃ) এর সুন্নাহ। ইতিহাস সাক্ষী যতদিন পর্যন্ত মুসলমানগণ এ দুটি জিনিস আঁকড়ে ধরেছিল ততদিন পর্যন্ত তারা বিশ্বে বিজয়ীর আসনে অধিষ্ঠিত থেকেছে। বিশ্বের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মুসলমানদের হাতে থেকেছে। আর যখন থেকে এরা ইসলামের বিধান অনুসরণ করা ছেড়ে দিয়েছে এবং অন্যান্য জাতির স্বভাব আচরণরপ্ত করেছে তখন থেকে হয়েছে পরাজিত, লাঞ্ছিত। হয়েছে অপদস্থ অপমানিত। শাসকের জাতি পরিণত হয়েছে শোষিতের জাতিতে। যারা এরূপ আংশিক মুসলমান তাদেরকে আলকুরআনে আল্লাহ তায়ালা হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তবে কি তোমরা আল্লাহর বিধানের কিছু অংশ মানবে আর কিছু অংশ অমান্য করবে? যারাই এরূপ করবে তাদের জন্য পৃথিবীতেই রয়েছে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা-অবমাননা; আর আখেরাতেও রয়েছে কঠোর শাস্তি। (সূরা বাকারা, আয়াতঃ ৮৫)

সুতরাং হৃত গৌরব ফিরে পেতে হলে মুসলামানদেরকে আবার ইসলামের ছায়াতলে ফিরে আসতেই হবে। ইসলামের পূর্ণ অনুসরণ করতেই হবে। ইসলামের পূর্ণ অনুসরণ করতে হবে পরকালীন মুক্তি ও কল্যাণের লক্ষ্যে।

# ভবিষ্যদ্বাণী - আঠার

## হযরত নূহ (আঃ) এর নৌকা সংরক্ষিত থাকবে।

পবিত্র কুরআনের সূরা কামারের ১৫ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, আমি নূহকে আরোহন করালাম কাঠ ও পেরেক দ্বারা নির্মিত এক জলযানে- যা চলতো আমার দৃষ্টির সামনে। এটা তার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ ছিল যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। আমি একে এক নিদর্শন স্বরূপ রেখে দিয়েছি। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি?"

পথভ্রষ্ট মানুষদেরকে সাবধান করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পূর্ববর্তীকালের অনেকগুলো বিস্ময়কর নিদর্শন পরবর্তীকালের মানুষদের জন্য সংরক্ষন করে রেখে দিয়েছেন। এসব নিদর্শন দেখলে মানুষের ঈমান বেড়ে যায় এবং আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের চিন্তা জাগরুক হয়। ফিরআউনের মৃতদেহ এবং নূহ (আঃ) এর নৌকা এই নিদর্শনগুলোর অন্যতম।

হযরত নূহ (আঃ)ছিলেন আদিযুগের নবীদের একজন। তিনি প্রথম পুরুষ হযরত আদম (আঃ) এর ১০ম তম অধস্থন পুরুষ। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে তিনি ইরাকে জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর জীবন কাল ছিল প্রায় সাড়ে নয়শত বছর। এই সুদীর্ঘ জীবন কালে তিনি বর্তমান ইরাকের দাজলা ও ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় আল্লাহর দ্বীন প্রচারে ব্যপৃত ছিলেন। সুদীর্ঘ কাল ধরে দিবারাত্র নিরালস প্রচেষ্টা সত্ত্বেও খুব বেশি লোককে তিনি দ্বীন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারেন নি। মাত্র ৮০ জন লোক ছাড়া আর কেউ তাঁর দীন গ্রহন করেন নি।

তারা যে শুধু তাঁর দীনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাই নয় বরং তাঁর এবং তাঁর দীন প্রচারের বিরুদ্ধে সবরকমের প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। তারা হযরত নূহ (আঃ এর উপর নির্যাতন করতে করতে তাক অজ্ঞান করে ফেলত। অবশেষে হযরত নূহ (আঃ) দেখলেন যে, এদের আল্লাহর দ্বীনের প্রতি ঈমান আনার আর কোন আশা ভরসা নেই তখন তিনি এদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুয়া করলেন।

(নূহ) বললেন, হে আমার রব, আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্র দাওয়াত দিয়েছি। কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। আমি যতবারই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি - যাতে আপনি তাদের ক্ষমা করেন ততবারই তারা কানে আঙুল দিয়েছে। মুখমণ্ডল ঢেকেছে, অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে" ------- নূহ আরও বলেন, হে আমার রব, আপনি কোন কাফের গৃহবাসীকে রেহাই দেবেন না। যদি রেহাই দেন তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী কাফের" (সূরা নূহ)।

আল্লাহ তাআলা দুয়া কবুল করলেন এবং এক মহাপ্লাবন দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করার কথা তাঁর নবী নূহ (আঃ) কে জানিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর নবীকে একটি নৌকা তৈরী করার জন্য নির্দেশ দিলেন। আল্লাহর নির্দেশে এবং হযরত জিবরীল (আঃ) এর প্রত্যক্ষ তত্তাবধানে হযরত নূহ (আঃ) একটি বিশাল নৌকা তৈরি করলেন। এই ভাবে হযরত নূহ (আঃ) হলেন পৃথিবীতে প্রথম জলযানবাহনের আবিষ্কারক। তেমনি ভাবে হযরত আদম (আঃ) হলেন পৃথিবীতে প্রথম স্থলযান তথা গাড়ির চাকার আবিষ্কারক। কালের প্ররিক্রমায় স্থলযানের অনেক উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন হলেও এই চাকার গুরুত্ব একটুও কমেনি বা এর বিকল্প আজও তৈরি হয়নি। আজও গরুর গাড়ি থেকে শুরু করে কোটি টাকার অত্যাধুনিক মোটর গাড়ির ভিত্তি হল আদম (আঃ) এর আবিষ্কৃত চাকা।

যাহোক, হযরত নূহ (আঃ) আবিষ্কৃত সেই প্রথম নৌকাটিই আমাদের আলোচ্য নিদর্শন যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পরবর্তীদের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছেন বলে পবিত্র কুরআনের উল্লেখিত আয়াতে বর্ণনা করেছেন।

হযরত নূহ (আঃ) কাফেরদেরকে মহাপ্লাবনের কথা জানালেন। কাফেররা মোটেই এ কথা বিশ্বাস করল না। তারা নৌকাটিকে ঠাট্টা উপহাসের বস্তুতে পরিণত করল। তারা ঠাট্টা পরিহাসের এমন পরাকাষ্ঠা দেখালো যে, সবাই এসে নৌকার মধ্যে

বাহ্যক্রিয়া সম্পাদন করতে লাগলো। কিছু দিনের মধ্যে বিশাল নৌকাটি মানুষের বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

অবস্থা বেগতিক দেখে হযরত নূহ (আঃ) প্রমাদ গুণলেন। আল্লাহর নবী আল্লাহর কাছে সকরুণ অনুযোগ করলেন। এমনিতেই তাদের ঠাট্টা বিদ্রূপের অন্ত নেই তার ওপর তারা মহা সুযোগ পেয়ে গেল।

সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা তার নবীকে কাফেরদের কাছে এ ভাবে অপদস্থ হতে দিতে পারেন না। আল্লাহ খাইরুল মাকিরীন। তিনি সহজেই এই মহা সমস্যার সমাধান করে দিলেন।

কাফেররা যখন নূহ (আঃ) এর নৌকা ভরে বাহ্যক্রিয়া সম্পাদন করতে লাগলো তখন দূর দূরান্তে এই খবর ছরিয়ে পড়ল। একদিন এক বৃদ্ধা মহিলা পুণ্য লাভের আশায় এই কাজে অংশ গ্রহণের জন্য তার সন্তানদের সাহায্য কামনা করল। সন্তানদের সহযোগিতায় বৃদ্ধা যখন পুণ্যকর্মে অংশ নিতে গেল তখন এক মহা অঘটন ঘটে গেল। হাত ফসকে পড়ে গিয়ে বৃদ্ধা নৌকা ভরা বিষ্ঠার মধ্যে টুপ করে ডুবে গেল। তার ছেলেরা যখন তাকে তাড়াতাড়ি করে টেনে তুলল, তখন দেখা গেল এক অলৌকিক ব্যাপার। বয়োবৃদ্ধা মাহিলা এক সুন্দরী তন্বী-তরুণীতে পরিণত হয়ে গেছে। বিষ্ঠার দুর্গন্ধের পরিবর্তে তার দেহ বল্লরী অপরূপ বূপ লাবণ্যে ও সৌন্দর্য-সুষমা-সুরভিতে পরিপূর্ণ। পরবর্তীতে সমগ্র নৌকার বিষ্ঠা হয়ে গেল মানুষের মনোবাসনা পূরনের এক মহৌষধ। যে কেউ যে আশায় কাজে লাগায় সেই আশাই পূরণ হয়। বৃদ্ধরা যুবতী হয়, কালোরা ফর্সা হয়, দুরারোগ্য ব্যাধি ভালো হয়, কুষ্ঠরোগ নিরাময় হয়, অন্ধরা দৃষ্টি ফিরে পায়। চারদিকে খবর ছরিয়ে পড়লো। সে এক এলাহি কাণ্ড। দূর দূরান্ত থেকে লোকজন ছুটে এসে এই মহৌষধ সংগ্রহ করতে লাগলো। মহৌষধ সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় যারা পেছনে পড়ে গিয়েছিল তারা এসে দেখল সব শেষ। তারা পুরো নৌকা পানি দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে সেই পানি নিয়ে গেল। এভাবে নৌকা আবার পূর্বের অবস্থা ফিরে পেল।

তারপর একদিন শুরু হল সেই প্রতিশ্রুত মহাপ্লাবন। নূহ (আঃ) ৮০ জন ইমানদার নারীপুরুষ এবং প্রত্যেক প্রজাতির একজোড়া করে প্রাণী নিয়ে নির্বিঘ্নে নৌকায় আরোহণ করলেন। একটানা ছয়মাস প্রবল বন্যা, বারি বর্ষণ, জলোচ্ছ্বাস আর ঝড় তুফানে সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেল। সারা পৃথিবী পানির নীচে ডুবে গেল। কেবলমাত্র নৌকার আরোহীগণ ছাড়া আর কোন জীব জীবিত থাকলো না। নৌকায় আরোহী মাত্র ৮০ জন মানুষ থেকেই পরবর্তীকালে পৃথিবীতে আবার মানুষের বিস্তার ঘটেছিল।

নূহ (আঃ) এর নৌকাটি তৈরি হয়েছিল একলক্ষ ১৪ হাজার তক্তা দিয়ে। প্রত্যেকটি তক্তায় একজন করে নবীর নাম লেখা ছিল। তিনতলা বিশিষ্ট নৌকাটির দৈর্ঘ্য ছিল ১২০০ হাত, প্রস্থ ছিল ৬০০ হাত।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩২ সালে বর্তমান ইরাকের উড় শহর থেকে সর্বপ্রথম প্লাবন শুরু হয় এবং একে একে সাড়া পৃথিবী পানির নীচে তলিয়ে যায়। দীর্ঘদিন পর প্লাবন শেষে নৌকাটি জুদী পাহাড়ে গিয়ে থামে। এই জুদী পাহাড় আজও হযরত নূহ (আঃ) ও তার সময়কালের মহাপ্লাবনের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ পাহাড়টি ৩৮০০ ফুট উঁচু এবং আর্মেনীয় আরারাত পর্বতমালার অন্তর্ভূক্ত। পাহাড়টি তুরস্ক ও আর্মেনীয়া সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত।

এই প্লাবন ও নৌকা প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "সে নৌকা নির্মাণ করিতে লাগিল এবং যখনই তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা তাহার নিকট দিয়া যাইত, তাহাতে উপহাস করিত; সে বলিত, তোমরা যদি আমাকে উপহাস কর তাহলে আমরাও তোমাদিগকে উপহাস করিব, যেমন তোমরা উপহাস করিতেছ;

এবং তোমরা অচিরে জানিতে পারিবে, কাহার উপর আসিবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আর কাহার উপর আপতিত হইবে স্থায়ী শাস্তি।

অবশেষে যখন আমার আদেশ আসিল এবং উনান উথলিয়া উঠিল, আমি বলিলাম, ইহাতে উঠাইয়া লও প্রত্যেক শ্রেণীর যুগল, যাহাদিগের বিরুদ্ধে পূর্ব-সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহারা ব্যতীত তোমার পরিবার পরিজনকে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে। তাহার সঙ্গে ঈমান আনিয়াছিল অল্প কয়েক জন।'

সে বলিল, ইহাতে আরোহণ কর, আল্লাহর নামে ইহার গতি ও স্থিতি, আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' পর্বত-প্রমাণ তরঙ্গ মধ্যে ইহা তাহাদিগকে লইয়া বহিয়া চলিল; নূহ তাহার পুত্র, যে উহাদিগর হইতে পৃথক ছিল, তাহাকে আহবান করিয়া বলিল, হে আমার পুত্র! আমাদিগের সঙ্গে আরোহণ কর এবং কাফিরদিগের সঙ্গী হইও না।'

সে বলিল, আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় লইব যাহা আমাকে প্লাবন হইতে রক্ষা করিবে।' সে (নূহ) বলিল, আজ আল্লাহর বিধান হইতে রক্ষা করিবার কেহ নাই, যাহাকে আল্লাহ দয়া করিবেন, সে ব্যতীত।' ইহার পর তরঙ্গ উহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল এবং সে নিমজ্জিতদিগের অন্তর্ভুক্ত হইল।

ইহার পর বলা হইল, হে পৃথিবী! তুমি তোমার পানি গ্রাস করিয়া লও এবং হে আকাশ! ক্ষান্ত হও।' ইহার পর বন্যা প্রশমিত হইল এবং কার্য সমাপ্ত হইল। নৌকা জুদী পর্বতের উপর স্থির হইল এবং বলা হইল, জালিম সম্প্রদায় ধ্বংস হউক। (সূরা হুদঃ ৩৮-৪৪)

# ভবিষ্যদ্বাণী - উনিশ
## বরং আমিই তোমাকে হত্যা করব

উবাই ইবনে খালাফ মক্কায় অবস্থানকালে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতোঃ হে মুহাম্মদ (সাঃ) আমার একটা ঘোড়া আছে তার নাম আওজ। তাকে আমি প্রতিদিন এক ফারাক (প্রায় ৪০ কেজি) ভুট্টা খাওয়াই। এই ঘোড়ায় চড়েই আমি যুদ্ধের ময়দানে তোমাকে হত্যা করব। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) জবাব দিতেনঃ বরং ইনশাআল্লাহ্ আমিই তোমাকে হত্যা করব। (সিরাতে ইবনে হিশাম)

হযরত রাসূলে মকবুল (সাঃ) জীবনে মাত্র এই একজন ব্যক্তিকেই নিজ হাতে হত্যা করেছিলেন। উবাই ইবনে খালাফ ছাড়া আর কোন ব্যক্তি সরাসরি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর হাতে নিহত হয়নি। অথচ তিনি জাহেলিয়াতকে উৎখাত করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে জীবনে কমপক্ষে সাতাশটি যুদ্ধ করেন। নয়টি যুদ্ধে তিনি স্বয়ং সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এতদসত্ত্বেও তাঁর নিজ হাতে মাত্র একজন লোক নিহত হওয়ার বিষয়টি নবীজীর (সাঃ) রহমাতুল্লিল আলামীন হওয়ারই আরেকটি প্রমাণ। তার জীবদ্দশায় ২৭টি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে যত লোক নিহত হয় তাদের সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে অতি নগণ্য।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবনে অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ যুদ্ধ ছিল উহুদের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় ঘটে এবং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর শাহাদাত লাভের গুজব ছড়িয়ে পড়ে।

পরাজয় ঘটার এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাহাদাত লাভের গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) সর্ব প্রথম চিনতে পারেন কা'ব ইবনে মালিক। কা'ব বলেনঃ শিরাস্ত্রাণের ভেতর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ দুটি জ্বলজল্ করছিল আর তা দেখেই আমি তাঁকে চিনতে পারলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বললাম "হে মুসলমানগণ সুসংবাদ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বেঁচে আছেন। তিনি এখানে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে ইশারা করে বললেন, তুমি চুপ থাক।"

মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) চেনার পর তাঁকে নিয়ে সবাই পর্বতের ঘাঁটিতে চলে গেলেন। এই সময় রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে ছিলেন আবু বকর সিদ্দীক, উমার ফারুক, আলী ইবনে আবু তালিব, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ ও জুবাইর ইবনুল আওয়ামসহ একদল সাহাবী।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পর্বতের ঘাঁটিতে যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন উবাই ইবনে খালফ সেখানে পৌঁছালো। সে বললো, "হে মুহাম্মদ, এ যাত্রা তুমি প্রাণে বেঁচে গেলেও তোমার নিস্তার নেই।" সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ এ লোকটিকে সহানুভূতি

দেখানো কি আমাদের জন্য ঠিক হবে? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ওকে আসতে দাও। সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে এলে তিনি হারেস ইবনে সিম্মার বর্শাটি হাতে নিলেন। (কোন কোন বর্ণনা অনুসারে) বর্শা হাতে নেয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এমন ভয়ঙ্কর পাঁয়তারা করলেন যে, উট প্রবল জোরে নড়ে উঠলে তার পিঠের ওপর বসা বিষাক্ত ভিমরুলের ঝাঁক যেমন ছত্রভঙ্গ হয়ে উড়ে যায়, আমরা ঠিক তেমনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছ থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে দূরে সরে পড়লাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তার ঘাড়ের ওপর বর্শার আঘাত হানলেন। আঘাত খেয়ে উবাই ইবনে খালফ তার ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়লো এবং বেশ কয়েকটা গড়াগড়ি খেলো।

ইতিপূর্বে উবাই ইবনে খালাফ মক্কায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাথে দেখা করে বলতোঃ হে মুহাম্মাদ, আমার একটা ঘোড়া আছে। তার নাম 'আওজ' তাকে আমি প্রতিদিন এক ফারাক (প্রায় ৪০ কেজি ) ভুট্টা খাওয়াই। এই ঘোড়ায় চড়েই আমি তোমাকে হত্যা করবো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জবাব দিতেন, বরং আল্লাহ চাহেতো আমিই তোমাকে হত্যা করব।

উবাইয়ের কাঁধে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে জখমটি করে দিয়েছিলেন সেটা তেমন গুরুতর জখম না হলেও তা দিয়ে রক্ত ঝরছিল এবং ঐ অবস্থাতেই সে কুরাইশদের কাছে ফিরে গিয়ে বললোঃ মক্কায় থাকা কালেই মুহাম্মাদ আমাকে বলেছিল, তোমাকে আমি হত্যা করবো। এখন আমার আশংকা হয়, সে যদি আমার প্রতি শুধু থুথু নিক্ষেপ করে তা হলেও আমি মরে যাবো।

কুরাইশরা তাকে নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হল। পথিমধ্যে সারেফ নামক স্থানে আল্লাহর এই দুশমনের জীবন-লীলা সাঙ্গ হলো।

উবাই ইবনে খালফ ছিল মক্কার শীর্ষস্থানীয় ধন্যাঢ্য কুরাইশ নেতা। ইসলাম ও ইসলামের নবীর সে ছিল কট্টর দুশমন। তার অঢেল সম্পদ এমনকি নিজের জীবনও সে ইসলামের বিরোধিতায় উৎসর্গ করেছে। পারস্যের বিরুদ্ধে রোমের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে সূরা রুম নাজিল হলে উবাই এ কথা বিশ্বাস করল না। সে এই মর্মে হযরত আবু বকর (রাঃ) এর সাথে বাজি ধরল যে, যদি রোম বিজয়ী হয় তাহলে সে একশত উট প্রদান করবে। এই ঘটনার কয়েক বছর পর ৬২৩ খ্রিস্টাব্দে রোম পারস্য সাম্রাজ্যকে ধূলিসাৎ করে বিজয় লাভ করে। বাজিতে হেরে যাওয়ায় উবাই ইবনে খালাফ হযরত আবু বকর (রাঃ) কে একশত উট প্রদান করে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নির্দেশে সবগুলো উট মানুষের মাঝে বিতরণ করে দেন।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগে ইসলামের কট্টর দুশমনদের মধ্যে যে প্রবল ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্যাদাবোধ ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার উন্নত মনমানসিকতা ছিল আজকের যুগের ইসলাম বিরোধীদের কাছে তা মোটেও আশা করা যায় না।

# ভবিষ্যদ্বাণী : বিশ

## সাকিফ গোত্রে একজন মিথ্যুক ও একজন নরঘাতকের জন্ম হবে

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাকিফ গোত্রে এক মিথ্যাবাদী ও এক নরঘাতকের জন্ম হবে"।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। হাজ্জাজ যে সব লোককে গোফতার করে এনে হত্যা করে তাদের সংখ্যা ছিল এক লাখ বিশ হাজার (তিরমিযী)

হাজ্জাজ যখন মক্কা আক্রমণ করে তখন মক্কার গভর্নর ছিলেন আবুদুল্লাই ইবনে জুবাইর (রাঃ)। হাজ্জাজ তাকেও শহীদ করে শুলে চড়িয়ে রাখে। হযরত আবদুল্লাহর (রাঃ) মা হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) পুত্রের শাহাদাতের তৃতীয় দিনে এক দাসীকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। ঘটনাক্রমে হাজ্জাজও সে সময় সেখানে ঘোরাফিরা করছিল। হযরত আসমা (রাঃ) হাজ্জাজকে বললেন, এই সওয়ারের নামার সময় কি এখনও হয়নি? হাজ্জাজ জবাব দিলঃ সে মুলহিদ ছিল। এই শাস্তি তার প্রাপ্য ছিল। হযরত আসমা (রাঃ) গর্জে উঠলেন এবং বললেন, খোদার কসম, সে খোদাদ্রোহী বা মুলহিদ ছিল না; বরং নামাযী রোজাদার এবং মুত্তাকী ছিল।

হাজ্জাজ ঝাঁজালো কণ্ঠে বলল, এই বুড়ি, তুমি এখান থেকে চলে যাও। তোমার জ্ঞান লোপ পেয়েছে। হযরত আসমা (রাঃ) অত্যন্ত নির্ভীকতার সাথে জবাব দিলেন, আমার জ্ঞান লোপ পায়নি। খোদার কসম, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, বনু সাকীফ গোত্রে এক মিথ্যাবাদী এবং এক জালেমের জন্ম হবে। মিথ্যাবাদীকে (অর্থাৎ মুখতার বিন আবু উবায়েদ সাকাফী) তো আমরা দেখেছি। আর তুমি হলে সেই জালেম।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক মিথ্যাবাদী ও নরঘাতক উপাধিপ্রাপ্ত আল মুখতার ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফ উভয়েই ছিল তায়েফ নগরীর অধিবাসী এবং সেখানকার বিখ্যাত সাকিফ গোত্রের অন্তর্ভূক্ত। সাকিফ গোত্রের লোকেরা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও সম্পদশালী।

মিথ্যাবাদী আল মুখতার প্রথম দিকে ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর পক্ষে ছিল; কিন্তু পরে মুয়াবিয়ার পক্ষ অবলম্বন করে। পরবর্তীতে কারবালার যুদ্ধে সে পুনরায় ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর দলে যোগ দেয়। এজন্য উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ কর্তৃক কারারুদ্ধ হয়। কারামুক্ত হবার পর কুফা থেকে মক্কায় এসে মক্কার শাসক আবদুল্লাহ বিন জুবাইরের সাথে সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করে; কিন্তু তিনি তাকে বিশ্বাস করেন নাই।

মক্কা থেকে পুনরায় কুফায় ফিরে এসে আল মুখতার নিজেকে হোসাইন হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণকারী হিসেবে পরিচয় দিয়ে হযরত আলী (রাঃ) এর অনুসারী কুফাবাসীদেরকে সংগঠিত করে এবং এইভাবে নিজেকে কুফায় প্রতিষ্ঠিত করে। ৬৮৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকে পরাজিত ও হত্যা করে কুফার অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিপতিতে পরিণত হয়। তার উত্থানের মূলে হাতিয়ার ছিল মিথ্যা, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা।

উবাইদুল্লাহকে পরাজিত করার পর আল মুখতার আবদুল্লাই ইবনে জুবাইয়ের আনগত্য অস্বীকার করে। এতদিন পর্যন্ত সে আনুগত্যের ভান করে ছিল। সুতরাং ইবনে জুবাইর তাঁর ভাই মুসয়াবকে আল মুখতারের বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠান। মুসয়াব ছিলেন বসরার শাসনকর্তা। মুসয়াব তাঁর সেনাপতি মুহাল্লাবের সাহায্যে তাকে কুফার নিকট শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেন। শেষ পর্যন্ত আল মুখতারকে তার ৮০১৯ জন অনুসারীসহ হত্যা করা হয়।

উমাইয়া শাসনের ইতিহাসে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম যুগে হাজ্জাজ তায়েফের এক মক্তবের শিক্ষক ছিল। আরবী ভাষা ও সাহিত্যে সে ছিল একজন সুপণ্ডিত। তার যোগ্যতা, কর্মকুশলতা ও প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক তার উজির সভায় তাকে আসন দেয়। ৬৯২ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আব্দুল মালিক হাজ্জাজকে হিজাজের (মক্কার) গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে। ইবনে জুবাইরকে পরাজিত ও হত্যা করার পর ৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে হিজাজের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়। প্রায় কুড়ি বছর হাজ্জাজ এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

হাজ্জাজ একজন পণ্ডিত ও সুবক্তাও ছিল। আরবী লিপিতে হরকতের ও নোক্‌তার ব্যবহার প্রবর্তন করে আরবী বর্ণমালার পূর্ণতা সাধন তার বিশেষ কৃতিত্ব। উমাইয়া সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তারে তার বিশেষ কৃতিত্ব রয়েছে। তারই নেতৃত্বে মুহাম্মদ বিন কাসিম ভারতবর্ষের সিন্ধু ও মুলতান জয় করেন।

ঐতিহাসিক পি.কে হিট্টির মতে, হাজ্জাজ ছিল একজন রক্ত পিপাসু ও স্বেচ্ছাচারী শাসক এবং একজন খাঁটি 'নিরো'। স্যার উইলিয়াম মূর তাকে দুনিয়ার অন্যতম নিষ্ঠুর ও অত্যাচারি অবতার বলে আখ্যায়িত করেছেন। ঐতিহাসিক আমীর আলী তাকে হিংস্র প্রকৃতির লোক হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

(ইস. ইতিহাস, কে. আলী)

এই জন্যই রাসূলে করীম (সাঃ) এর পবিত্র জবান থেকে সাকীফ গোত্রের এই দুই কুলাঙ্গার ব্যক্তি সম্পর্কে তাদের জন্মের পূর্বের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত হয়েছিল। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে এই ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকর হয়েছিল।

# ভবিষ্যদ্বাণী - একুশ
## উসামা বিন জায়েদ (রাঃ) হত্যা

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উসামা (রাঃ) কে বলেছিলেন আফসোস! একদল বিদ্রোহী তোমাকে হত্যা করবে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর এই ভবিষ্যদ্বাণীটি মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। মুতাওয়াতির হাদিস হল ঐ সমস্ত হাদীস যা বহু সংখ্যক সাহাবী থেকে যুগে যুগে বহু সংখ্যক রাবী নির্ভুল সনদে বর্ণনা করেছেন। এগুলো সন্দেহমুক্ত হাদীস।

হযরত উসামা বিন জায়েদ (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পালক পুত্র হযরত জায়েদ বিন হারিসা (রাঃ) এর পুত্র। ইসলামের পরিবেশে এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর স্নেহধন্যে তিনি বড় হয়েছিলেন।

মদিনায় হিযরতের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে নববী নির্মাণের কাজ শুরু করলেন। অত্যন্ত আনন্দ ও উদ্দীপনা নিয়ে সাহাবগিণ মসজিদ নির্মাণের জন্য ভারি ভারি ইট বহন করছিলেন। রাসূলুল্লাহও (সাঃ) তাঁদের সাথে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, সবাই একটি করে ইট বহন করছে আর উসামা (রাঃ) একসাথে দুটি করে ইট বহন করছে। উসামা ছিলেন শক্তিশালী টগবগে তরুণ। তিনি উসামাকে লক্ষ্য করে বললেন, আফসোস! একদল বিদ্রোহী তোমাকে হত্যা করবে।

সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর এই কথা অন্তরে গেঁথে রেখেছিলেন। তারা অপেক্ষায় ছিলেন কখন এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়। তাঁরা জানতেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কোন কথা বৃথা হয় না। এর প্রায় চল্লিশ বছর পর সিফফিনের যুদ্ধে একদল বিদ্রোহী কর্তৃক হযরত উসামা (রাঃ) নিহত হন। হযরত মুয়াবিয়া ও হযরত আলী (রাঃ) এর মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুআবিয়া (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ, কৌশলী ও প্রতিভাবান রাজনীতিবিদ। এই যুদ্ধে বেশ কিছু জলিলুল কদর সাহাবী তাঁর পক্ষ নিয়েছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন হযরত তালহা ও হযরত যুবায়ের ইবনুল আওআম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম।

সিফফিনের যুদ্ধে হযরত মুয়াবিয়ার লোকদের হাতে উসামা (রাঃ) নিহত হলে সবার কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হযরত আলী (রাঃ) হকপন্থী এবং মুয়াবিয়াই (রাঃ) বিদ্রোহী বা সীমালংঘনকারী। তখন অন্যান্যদের সাথে হযরত তালহা ও হযরত যুবাইর (রাঃ) মুয়াবিয়ার পক্ষ ত্যাগ করেন। ফেরার পথে হযরত যুবাইর (রাঃ) বিদ্রোহীদের হাতে শহীদ হন। হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) মুয়াবিয়ার পক্ষ ত্যাগ করলেন না বটে; কিন্তু তিনি উসামাকে (রাঃ) হত্যার জন্য মুয়াবিয়া (রাঃ) কে দায়ী করেন এবং এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী তাকে স্মরণ করিয়ে দেন। মুয়াবিয়াও (রাঃ) এ কথা অস্বীকার করেন নাই যেহেতু তিনিও এই হাদীস জানতেন।

তবে তিনি এর কারণ বা দায় দায়িত্ব হযরত আলী (রাঃ) এর দলের উপর চাপাতে চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, আমরা নই যারা তাঁকে আমাদের বর্শার সামনে এগিয়ে দিয়েছে তারাই তাঁকে হত্যা করেছে। অর্থাৎ তারাই এই হত্যার জন্য দায়ী।

# ভবিষ্যদ্বাণী - বাইশ
## পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় পরবর্তী বছর নিকৃষ্টতর হবে

হাদীসঃ যুবাইর ইবনে আদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কয়েকজন আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) এর কাছে এসে আমাদের উপর হাজ্জাজের পক্ষ থেকে যে জুলুম নির্যাতন চলছিল সে সম্পর্কে তার নিকট অভিযোগ করলাম। তিনি বললেন, তোমাদের প্রতিটি বছর পূর্ববর্তী বছর অপেক্ষা নিকৃষ্টতর হবে, যাবৎ না তোমরা তোমাদের রবের সাথে মিলিত হও। আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একথা শুনেছি।

অপর এক হাদীস ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ আমার যুগই হল সর্বোৎকৃষ্ট যুগ। অতঃপর এর নিকটবর্তী যুগ, অতঃপর এর নিকটবর্তী যুগ। অতঃপর এমন যুগ আসবে যখনকার লোকেরা হবে স্থূলদেহী এবং তারা স্থূলদেহী হতে পছন্দ করবে। সাক্ষ্য চাওয়া না হলেও তারা সাক্ষ্য দেবে।"

উপরোক্ত হাদীস দুটি তিরমিযী শরীফ থেকে গৃহীত। হাদীস দুটি থেকে জানা যায়- যতই দিন যাবে ততই মানুষের ঈমান আমলের অবনতি ঘটতে থাকবে এবং এ কারণেই সার্বিক অবস্থারও অবনতি ঘটতে থাকবে। বহু সাহাবী এবং তাবেয়ী তাদের জীবদ্দশায় ঈমানের অবনতি প্রত্যক্ষ করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। মক্কা বিজয়ের আগে এবং মক্কা বিজয়ের পরে ঈমান গ্রহণকারী সাহাবীদের মর্যাদার পার্থক্যের কথা পবিত্র কুরআনের সূরা হাদীদে বর্ণিত রয়েছে। হাদীসের এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে এবং হচ্ছে।

ঈমানের অবনতি ঘটতে ঘটতে এমন এক যুগ আসবে যখন কেউ ঈমানের গুরুত্ব দিবে না। এ সম্পর্কে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে অন্ধকার রাতের টুকরার ন্যায় বিপর্যয় দেখা দিবে। সে সময়ে যে ব্যক্তি সকালে মুমিন থাকবে সন্ধ্যায় সে কাফের হয়ে যাবে।

আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে সকালে সে কাফের হয়ে যাবে। একদল লোক পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে তাদের দ্বীন বিক্রয় করবে।

এ সব হাদীসের সত্যতা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যদি পূর্বযুগের ঈমানদারদের সাথে বর্তমান যুগের ঈমানদারদের ঈমানের অবস্থা তুলনা করা হয় । প্রতি বছর ঈমান কমতে কমতে চৌদ্দশ বছর পর বর্তমানে কোন পর্যায়ে এসে পৌছেছে তা সহজেই অনুমেয়।

হিজরী ১৯ সন। মুসলিম জাহানের খেলাফতের দায়িত্ব পালন করছেন তখন আমীরুল মুমেনীন ওমর ফারুক (রাঃ)। খেলাফতের সাথে তৎকালীন বিশ্বের মহাপ্রতাপশালী রোমান সম্রাট কাইসারের তখন ঘোরতর যুদ্ধ চলছে। রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা তখন নিত্য দিনের ব্যাপার। এমনই এক যুদ্ধযাত্রায় শরীক হয়েছিলেন আব্দুল্লাহ ইবন হুজাইফা আস সাহমী (রাঃ)। রোমান সম্রাট কাইসার মুসলিম মুজাহিদদের ঈমান, বীরত্ব এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য অকাতরে জীবন বিলিয়ে দেওয়ার বহু কাহিনী শুনতেন। তাঁর কাছে এসব ঘটনা খুবই আশ্চর্য জনক মনে হত। তিনি কিছুতেই বুঝতে পারতেন না, কিভাবে মানুষ নিজের প্রিয় জীবনকে, আত্মীয়-স্বজনকে, স্ত্রী-পুত্রদেরকে দূরে ঠেলে দিয়ে মৃত্যুর পিছে এভাবে ছুটে বেড়াতে পারে। তাই তিনি তাঁর সৈন্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, কোন মুসলিম সৈনিক বন্দী হলে তাকে জীবিত অবস্থায় তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে।

আল্লাহর ইচ্ছায় হযরত আবদুল্লাহ ইবন হুজাইফা (রাঃ) রোমানদের হাতে বন্দী হলেন। রোমানরা তাঁকে তাদের সম্রাটের নিকট হাজির করে বলল ঃ "এ ব্যক্তি মুহাম্মাদের একজন সহচর, প্রথম ভাগেই সে তাঁর দ্বীন গ্রহণ করেছে। আমাদের হাতে বন্দী হয়েছে, আমরা আপনার নিকট উপস্থিত করেছি।"

রোমান সম্রাট আব্দুল্লাহর (রা) দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেনঃ 'আমি তোমার নিকট একটি বিষয় উপস্থাপন করতে চাই ।'

আব্দুল্লাহ বললেন : বিষয়টি কি ?

সম্রাটঃ আমি প্রস্তাব করছি, তুমি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ কর। যদি তা কর, তোমাকে মুক্তি দেব এবং তোমাকে সম্মানিতও করবো।

বন্দী আবদুল্লাহ খুব দ্রুত ও দৃঢ়তার সাথে বললেন ঃ আফসোস! যে দিকে আপনি আহ্বান জানাচ্ছেন তার থেকে হাজার বার মৃত্যু আমার অধিক প্রিয়।

সম্রাট ঃ আমি মনে করি তুমি একজন বুদ্ধিমান লোক। আমার প্রস্তাব মেনে নিলে আমি তোমাকে আমার ক্ষমতার অংশীদার বানাবো, আমার কন্যা তোমার হাতে সমর্পণ করবো এবং আমার এ সাম্রাজ্য তোমাকে ভাগ করে দেব।

বেড়ী পরিহিত বন্দী মৃদু হেসে বললেনঃ আল্লাহর কসম, আপনার গোটা সাম্রাজ্য এবং সেই সাথে আরবদের অধিকারে যা কিছু আছে সবই যদি আমাকে দেওয়া

হয়, আর বিনিময়ে আমাকে বলা হয় এক পলকের জন্য মুহাম্মাদ (সা) এর দ্বীন পরিত্যাগ কর, আমি তা করবো না।

সম্রাট ঃ তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করবো।

সম্রাটের নির্দেশে বন্দীকে শূলীকাষ্ঠে ঝুলিয়ে কষে বাঁধা হল। দু'হাতে ঝুলিয়ে বেঁধে খ্রিস্টধর্ম পেশ করা হল, তিনি অস্বীকার করলেন। তার পর দু'পায়ে ঝুলিয়ে বেঁধে ইসলাম পরিত্যাগের আহবান জানানো হল, এবারও তিনি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন।

সম্রাট তার লোকদের থামতে বলে তাঁকে শূলীকাষ্ঠ থেকে নামিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন। তারপর বিশাল এক কড়াই আনিয়ে তার মধ্যে তেল ঢালতে বললেন। সে তেল আগুনে ফুটানো হল। টগবগ করে যখন তেল ফুটতে লাগল তখন অন্য দু'জন মুসলমান বন্দীকে আনা হল। তাদের একজনকে সেই উত্তপ্ত টগবগ করে ফোটা তেলের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল। ফেলার সাথে সাথে বন্দীর দেহের গোশত ছিন্ন ভিন্ন হয়ে হাড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

সম্রাট আব্দুল্লাহর দিকে ফিরে তাকে আবার খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানালেন। আবদুল্লাহ এবার পূর্বের চেয়েও ঘৃণা ভরে খ্রিস্ট ধর্ম প্রত্যাখ্যান করেলেন।

সম্রাটের নির্দেশে এবার আবদুল্লাহকে সেই উত্তপ্ত তেল ভর্তি কড়াইয়ের কাছে আনা হল। এবার আবদুল্লাহর চোখে অশ্রু দেখা গেল।

লোকেরা সম্রাটকে বললঃ 'বন্দী এবার কাঁদছে'।

সম্রাট মনে করলেন , বন্দী ভীত হয়ে পড়েছে। তিনি নির্দেশ দিলেন, 'বন্দীকে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

তাঁকে আনা হল । এবারও তিনি ঘৃণাভরে খ্রিস্ট ধর্ম প্রত্যাখান করলেন।

সম্রাট তখন আবদুল্লাহকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'তোমার ধ্বংস হোক! তাহলে কাঁদছো কেন ?'

আবদুল্লাহ জবাব দিলেনঃ আমি একথা চিন্তা করে কাঁদছি যে, এখনই আমাকে কড়াইয়ের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলা হবে এবং আমি শেষ হয়ে যাব। অথচ আমার একান্ত ইচ্ছা আমার দেহের পশমের সমসংখ্যক জীবন যদি আমার হতো এবং সবগুলিই আল্লাহর রাস্তায় এই কড়াইয়ের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারতাম।

এবার আল্লাহদ্রোহী সম্রাটের মধ্যে ভাবান্তর হল। বললেনঃ অন্ততপক্ষে তুমি যদি আমার মাথায় একটা চুম্বন কর, তোমাকে আমি ছেড়ে দেব।

আবদুল্লাহ প্রথমে এ প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করলেন। তবে শর্ত আরোপ করে বললেনঃ 'যদি আমার সাথে অন্য বন্দীদেরও মুক্তি দেওয়া হয়, আমি রাজি আছি'।

সম্রাট বললেন, 'হ্যাঁ, অন্যদেরও ছেড়ে দেওয়া হবে।'

আবদুল্লাহ বললেন, 'আমি মনে মনে বললাম, বিনিময়ে অন্য মুসলিম বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে, এতে কোন দোষ নেই।' তিনি সম্রাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে

তার মাথায় চুমু দিলেন। রোমান সম্রাটও মুসলিম বন্দীদের ছেড়ে দিতে বললেন। এই বন্দীদের মধ্যে ছিলেন ৮০ জন।

মৃত্যুকে বাজি রেখে মুক্তি পেলেন মুজাহিদবৃন্দ। আল্লাহর পথের সৈনিকেরা এবার ফিরে চললেন মদীনার উদ্দেশ্যে । খলীফা ওমর ফারুক (রা:) এর কাছে উপস্থিত হয়ে পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন আল্লাহর রাসূল (সা:) এর প্রিয় সাহাবী ঈমানের দীপ্ত বলে বলীয়ান আবদুল্লাহ ইবন হুজাইফা আস-সাহমী (রা)

পুরো ঘটনা শুনে খলীফা আনন্দে ফেটে পড়লেন। তিনি উপস্থিত বন্দীদের প্রতি তাকিয়ে বললেনঃ 'প্রতিটি মুসলমানের উচিত আবদুল্লাহ ইবন হুজাইফার মাথায় চুমু দেয়া এবং আমিই তার সূচনা করছি।' এই বলে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর মাথায় চুম্বন করলেন।

**খলীফা উমার (রা:) এর শাসন কাল।** মুয়াবিয়া তখন সিরিয়ার শাসনকর্তা। মদীনার খাযরাজ গোত্রের হযরত উবাদা ইবন সামিত গেলেন সিরিয়ায়। বাইয়াতে রিদওয়ানে শরীক আনসার সাহাবী উবাদা ইবন সামিত (রা:) সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে দুনিয়ার কোন মানুষকেই ভয় করেন না। সিরিয়ায় ব্যবসা ও শাসন কার্যে কতকগুলো অনিয়ম দেখে তিনি ক্রোধে জ্বলে উঠলেন।

দামেশকের মসজিদ। সিরিয়ার গভর্ণর মুয়াবিয়াও উপস্থিত মসজিদে। নামাযের জামাত শেষে হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা:) উঠে দাঁড়িয়ে মহানবীর (সাঃ) একটি হাদীস উদ্ধৃত করে তীব্র ভাষায় অভিযুক্ত করলেন হযরত মুয়াবিয়াকে। চারদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। মুয়াবিয়ার পক্ষে তাঁর মুখ বন্ধ করা সম্ভব হলো না। একা উবাদা ইবনে সামিত গোটা সিরিয়াকে যেন নাড়া দিলেন। ইতোমধ্যে হযরত উমার (রাঃ) ইন্তি কাল করেছেন। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে হযরত মুয়াবিয়া তৃতীয় খলীফা হয়রত উসমানকে (রা:) লিখলেন, "হয় আপনি উবাদাকে মদীনায় ডেকে নিন, নতুবা আমিই সিরিয়া ত্যাগ করব। গোটা সিরিয়াকে উবাদা বিদ্রোহী করে তুলেছে।"

উবাদাকে মদীনায় ফিরিয়ে আনা হলো। মদীনায় এসে হযরত উবাদা সোজা গিয়ে হযরত উসমানের (রা:) বাড়িতে উঠলেন। হযরত উসমান (রা:) ঘরে বসে। ঘরের বাইরে প্রচুর লোক। তিনি ঘরে ঢুকে ঘরের এক কোণে বসে পড়লেন। হযরত উসমান জিজ্ঞাসা করলেন " কি খবর।" হযরত উসমান (রাঃ) এর কথার উত্তরে উবাদা উঠে দাঁড়ালেন। স্পষ্টবাদী, নির্ভীক উবাদা (রাঃ) বললেন," স্বয়ং মহানবীর উক্তিঃ পরবর্তী কালের শাসকরা অসত্যকে সত্যে এবং সত্যকে অসত্যে পরিণত করবে। কিন্তু পাপের অনুকরণ বৈধ নয়, তোমরা কখনও অন্যায় করো না।"

হযরত আবু হুরাইরা (রা ) কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। হযরত উবাদা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, " যখন আমরা মহানবীর (সাঃ) হাতে বাইয়াত করি, তখন তোমরা ছিলে না, কাজেই তোমরা অনর্থক কথার মাঝখানে বাধা দাও কেন ? আমরা সেদিন মহানবীর (সাঃ) কাছে শপথ করেছি সুস্থতা ও অসুস্থতা সব অবস্থায়ই আপনাকে

মেনে চলব, প্রাচুর্য ও অর্থ সংকট সব অবস্থায়ই আপনাকে অর্থ সাহায্য করব, ভাল কথা অন্যের কাছে পৌছাব, অন্যায় থেকে সবাইকে বারণ করব। সত্য কথা বলতে কাউকে ভয় করবো না ।" হযরত উবাদা এসব শপথের প্রতিটি অক্ষর পালন করে গেছেন জীবনের শেষ পর্যন্ত।

তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্তে তাঁকে কিছু অসিয়ত করতে বলা হলে তিনি বললেন, " যত হাদীস প্রয়োজনীয় ছিল, তোমাদেরকে পৌছে দিয়েছি, আর একটি হাদীস ছিল, বলছি শুন।" হাদীস বর্ণনা শেষ হবার সাথে সাথেই হযরত উবাদা ইবন সামিত ইন্তিকাল করলেন।

**উহুদের যুদ্ধে রাসুলের (সা) বহু সাহাবী নিহত হন।** সে এক চরম পরীক্ষার দিন। সংবাদ রটে গেল, এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) শহীদ হয়েছেন। কিন্তু তাঁকে সেদিন তাঁর প্রিয় অনুচরগণ মানব দেহের প্রাচীর তুলে রক্ষা করেছিলেন।

রাসূলের (সা) মিথ্যা মৃত্যু সংবাদে একজন আনসার মহিলা ছুটে চললো উহুদের মাঠের দিকে। একজন লোককে দেখে জিজ্ঞাসা করলো, "রাসূল কি অবস্থায় আছেন ?"

লোকটি জানে রাসুল নিরাপদে আছেন, তাই প্রশ্নের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সে বলল "তোমার পিতা শহীদ হয়েছেন।" মূহূর্তে বিবর্ণ হয়ে উঠলো তাঁর মুখ। নিজকে সংযত করে মহিলাটি জিজ্ঞাসা করল,"রাসূল কেমন আছেন, তিনি কি জীবিত?"

"তোমার ভাইও নিহত হয়েছে।"

মহিলা আবার সেই একই প্রশ্ন ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল। তখন সে আবার বলল, "তোমার স্বামীও শহীদ হয়েছেন।"

সকল শক্তি একত্র করে মহিলা তিক্ত স্বরে বলল, "আমার কোন পরমাত্মীয় মারা গেছে তা আমি জিজ্ঞাসা করছিনে, আমাকে শুধু বল আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কেমন আছেন ?"

লোকটি উত্তর দিলেন, "তিনি নিরাপদেই আছেন।" মুহূর্তে মহিলাটির বিবর্ণ মুখে আনন্দের আভাস দেখা দিল। উল্লসিত হয়ে সে বললো, "আত্মীয় বন্ধুদের প্রাণদান তবে ব্যর্থ হয়নি।"

ব্যর্থ হয় না। কোন দিনই ব্যর্থ হয় না। একটি প্রাণের একটি পবিত্র জীবনের আত্মাহুতি সত্যের আলোক শিখা, সত্যের উদাত্ত বাণীকে আরও তীব্রতর, আরও জ্যোতির্ময় করে তোলে।

একজন নারীর কাছে আপন সন্তান ও স্বামী হারানোর বেদনাও তুচ্ছ হয়ে যায় কোন পর্যায়ের ঈমান থাকলে তা বলাই বাহুল্য।

আরেক মহিলা ব্যভিচারের কারণে রাসূল (সা:) এর কাছে এসে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা:) তাঁকে বার বার ফিরিয়ে দিলেও এক পর্যায়ে তিনি এসে মৃত্যুদণ্ড নিয়ে তাঁর তওবা পূরণ করলেন। তাঁর তওবা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ

(সা:) বলেন, সে যে তওবা করেছে তা সমস্ত মদীনাবাসীর মধ্যে ভাগ করে দিলে তা যথেষ্ঠ হবে। এই ছিল প্রথম যুগের , ইসলামের স্বর্ণযুগের মুমিনদের ঈমানের অবস্থা। বর্তমান যুগে কি এমন ঈমানের কথা চিন্তা করা যায়?

**হাকীম ইবনে হিযাম (রা:) প্রথম যুগের সাহাবী ছিলেন।** তিনি একবার রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিকট কিছু সাহায্য চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা:) তাকে কিছু সাহায্য দিলেন বটে, তবে বুঝিয়ে দিলেন, এভাবে হাত পাতা ভাল কাজ নয়। বললেন, "নীচের হাতের চেয়ে উপরের হাত উত্তম"।

হাকীম (রা:) রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বললেন, আপনার পর আর কারো কাছে কিছু চাইবো না। সারা জীবন তিনি শত কষ্টের মধ্যেও একথার উপর দৃঢ় ছিলেন। কখনো কারো দান গ্রহণ করেন নি। রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে দেওয়া কথার তিনি অন্যথা করেননি। হযরত আবু বকর(রা:) ও উমার (রা:) এর যুগে সম্পদের প্রাচুর্য হলে সবাই সম্পদ লাভ করলেন কিন্তু হাকিম ইবনে হিযাম (রা:) তাঁদের দান সবসময়ই ফিরিয়ে দিয়েছেন।

**রবি বিন খাইসাম ছিলেন একজন তাবেয়ী।** তিনি সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের বন্ধু ছিলেন। বহু বছর তিনি তাঁর বন্ধুর বাড়িতে আসা যাওয়া করেছেন। দরজায় নক করলে বন্ধু আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের দাসী এসে দরজা খুলে দিত। কোনদিন তিনি ঐ দাসীর দিকে চোখ তুলে তাকাননি। সর্বদা দৃষ্টি নীচু করে রাখতেন। " তোমরা তোমারদের দৃষ্টিকে অবনত রাখ" - আল কুরআনের এই নিদের্শের পুরোপুরি অনুসরণ করতেন তিনি। এজন্য রবী বিন খাইসাম যখনই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের বাড়ীতে আসতেন, দাসী দরজা খুলে দিয়ে ভিতরে গিয়ে বলতো, আপনার ঐ অন্ধ বন্ধুটি এসেছেন। দাসী তাঁকে অন্ধ মনে করতো। সেতো তার দৃষ্টি সবসময় অবনতই দেখেছে কোনদিন চোখ তুলে তাকাতে দেখে নি।

এই ছিল সাহাবী ও তাবেয়ীদের আমল এবং কুরআন সুন্নাহের অনুসরণ। এই ছিল প্রথম যুগের মুমিনদের ঈমানের অবস্থা। বর্তমান যুগে এসব কল্পনা করা যায় কি ?

মানুষের ঈমানের অবনতির সাথে সাথে সার্বিক পরিস্থিতিরও অবনতি ঘটছে এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বাণীর সত্যতা প্রমাণ করছে।

# ভবিষ্যদ্বাণী - তেইশ
## মুসলিম মিল্লাত কখনো ধ্বংস হবে না

সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন,"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ পৃথিবীকে আমার জন্য সংকুচিত করেন। ফলে আমি এর পূর্ব-পশ্চিম সবদিক অবলোকন করি। পৃথিবীর যতটুকু আমার জন্য সংকুচিত করা হয়েছে, অচিরেই আমার উম্মাতের রাজত্ব ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। আর লাল-সাদা (সোনা-রূপা) দু'টি খনিজ ভাণ্ডারই আমাকে দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু আমি আমার রবের কাছে আমার উম্মাতের জন্য ফরিয়াদ জানিয়েছি যে, তিনি যেন তাদেরকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষে ফেলে ধ্বংস না করেন এবং তাদের ছাড়া বিজাতি দুশমনদের যেন তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে না দেন যাতে তারা তাদেরকে সমূলে বিনাশ করার সুযোগ পায়। আমার প্রভু বলেন, হে মুহাম্মদ! আমি কোন ফয়সালা করলে তা মোটেই পরিবর্তিত হওয়ার নয়। আমি তোমার উম্মাতের জন্য মঞ্জুর করলাম যে, ব্যাপক দুর্ভিক্ষে তাদেরকে ধ্বংস করব না, নিজেদের ছাড়া অন্য কোন দুশমনদের তাদের উপর এমন আধিপত্য দান করব না যাতে তারা তোমার উম্মাতকে বিনাশ করতে সুযোগ পায়, এমনকি তারা (পৃথিবীর) সকল অঞ্চল থেকে একজোট হয়ে এলেও। তবে তারা পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করবে এবং কতক কতককে বন্দী করবে"। (তিরমিযী)।

অপর এক হাদীস থেকে জানা যায়, একদল লোক কিয়ামত পর্যন্ত (ইসলামের উপর) সত্যপন্থী হিসাবে অবশ্যই টিকে থাকবে।

মুসলিম মিল্লাত ও মুসলিম সভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্য যুগে যুগে শয়তানি অপশক্তি সব সময় তৎপর থেকেছে। এখনও তৎপর আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তারা যখনই সক্ষম হয়েছে তখনই মুসলমানদের উপর চড়াও হয়েছে। গণহত্যা, নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। বর্তমানে ইরাক, আফগানিস্তান, চেচনিয়া, বসনিয়া, কাশ্মীরসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেভাবে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে অতীতেও এমনিভাবে বর্বর শয়তানি শক্তি বহুবার তা করেছে। বিশেষ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার পীঠস্থান ইরাক বহুবার আক্রান্ত হয়েছে, বহুবার ধ্বংস হয়েছে ইরাকী সভ্যতা। অথচ মুসলমানদের শাসনাধীনে অমুসলিমরা সব সময় নিরাপদ ও শান্তিতে বসবাস করেছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, একমাত্র মুসলমানরাই সত্যপন্থি।

চেঙ্গিস খান বাগদাদ আক্রমণ করে প্রায় বিশ লক্ষ লোক হত্যা করে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়। তৎকালীন বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র ছিল বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়। মুসলমানরা ছিল জ্ঞান বিজ্ঞানে পাইওনিয়ার। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার ছিল বাগদাদের সমৃদ্ধ পাঠাগারসমূহ। চেঙ্গিস খান এ সব কিছুই ধ্বংস করে দেয়। বর্ণিত

আছে, চেঙ্গিস খানের ধ্বংসযজ্ঞের সময় বাগদাদের পাঠাগারগুলো থেকে যে বিপুল পরিমাণ বই-পুস্তক ফোরাত নদীতে ফেলে দেঁয়া হয় তাতে নদীর পানির প্রবাহ থমকে যায়। এভাবে নানা সময় বর্বর অপশক্তি মুসলিম জাতিকে নির্মুল করতে চাইলেও তারা সক্ষম হয়নি। মুসলিম জাতি আল্লাহর রহমতে টিকে আছে এবং থাকবে। কখনও মুসলিম জাতিকে কেউ সমূলে উৎখাত করতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, **"এরা আল্লাহর নূরকে এক ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ তার নূরকে (ইসলামকে) অবশ্যই বিজয়ী করবেন এতে কাফেরদের যতই মনোকষ্ট হোক না কেন।"** (সূরা সফ্)

# ভবিষ্যদ্বাণী - চব্বিশ

## ঈসা (আঃ) এর প্রতি বিশ্বাসীরা তাঁর প্রতি অবিশ্বাসীদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে

আল-কুরআনের সূরা আল ইমরানের ৫৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, 'হে ঈসা, আমি তোমাকে নিজের কাছে তুলে নেব, কাফেরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেবো। আর যারা তোমার অনুগত রয়েছে তাদেরকে কিয়মতের দিন পর্যন্ত যারা তোমাকে অস্বীকার করেছে তাদের উপর জয়ী করে রাখবো'।

উক্ত আয়াতে অনুগত বা অনুসারী অর্থ হয়রত ঈসা (আঃ) এর নবুওয়াতে বিশ্বসী যারা । সে হিসেবে খ্রিস্টান ও মুসলিম এই দুই সম্প্রদায় তাঁর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত।

খ্রিস্টানরা ঈসা (আঃ) এর প্রতি বিশ্বসী কিন্তু শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রতি বিশ্বসী নয়। ইহুদিরা শেষ দুই নবী ইসা (আঃ) ও মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রতি বিশ্বসী নয়। তারা নিজেদেরকে হযরত মূসা (আঃ) এর অনুসারী বলে দাবি করে। পক্ষান্তরে একমাত্র মুসলিমরাই, মূসা ও ঈসা সহ সকল নবীর প্রতি সমান বিশ্বাসী।

মূসা ও ঈসা (আঃ) এর বিধানগুলোর মধ্যে এটিও একটি বিধান ছিল যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আগমনের পর সবাইকে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে হবে। কিন্তু ঈহুদি ও খ্রিস্টানদের কেউ তা করে নি। ফলে তারা হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

খ্রিস্টানগণ ঈসার নবুওয়াতে বিশ্বসী হলেও সে বিশ্বাসে কিছু ভ্রান্তি আছে। ঈসা (আঃ) পুনরায় পৃথিবীতে যখন ফিরে আসবেন তখন তাদের এ ভ্রান্তি দূর হবে। ইহুদিরা ঈসা (আঃ) এর প্রতি যে কেবল ঈমান আনে নি তাই নয় বরং ঈসা (আঃ) এর

পুণ্যবতী মাতা মারইয়াম যিনি নারী জাতির শ্রেষ্ঠ চারজনের একজন তাঁর প্রতিও মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছিল। বিনা পিতায় জন্ম, কুমারী মায়ের সন্তান, ঈসা (আঃ) ছিলেন ইহুদিদের জন্য সুস্পষ্ট মুজিজা (miracle) যেন তারা ঈসার (আঃ) প্রতি ঈমান আনে। ইহুদিরা তা করেনি বরং তারা ঈসা (আঃ) কে শুলে বিদ্ধ করে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এ অবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিজের কাছে তুলে নেন বলে এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি চতুর্থ আসমানে অবস্থান করছেন। কিয়ামতের পূর্বে তিনি পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। উক্ত আয়াতে কৃত অঙ্গীকারের পর থেকে আজ পর্যন্ত যে দুই হাজার বছরের অধিককাল ধরে ইহুদি জাতির বিপক্ষে খ্রিস্টান ও মুসলমান জাতি সর্বদাই বিজয়ী রয়েছে এবং এতকাল ধরে আল-কুরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

বর্তমানে যদিও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদি ও খ্রিস্টান শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানই খ্রিস্টানদের বন্ধু, ইহুদিরা নয়। এ সত্য খ্রিস্টানরা বুঝতে পারবেন, যখন ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে ফিরে আসবেন এবং ইহুদিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদেরকে পৃথিবী থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন।

# ভবিষ্যদ্বাণী - পঁচিশ

## কিয়ামতের আগে সবাই ঈসা (আঃ) এর প্রতি ঈমান আনবে

'আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ অবশিষ্ট থাকবেনা বরং ওরা তাঁর (ঈসার) মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে"। (সূরা নিসাঃ ১৫৯)

অত্র আয়াতের তফসীর হলঃ আহলে কিতাবরা এখন হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রতি সত্যিকার ঈমান আনে না। তাদের বিশ্বাসে ভ্রান্তি আছে। ইহুদীরা তো তাকে নবী বলে স্বীকারই করতো না, বরং ভণ্ড, মিথ্যাবাদী ইত্যাকার আপত্তিকর বিশেষণে ভূষিত করতো। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালেক)। অপর দিকে খ্রিস্টানরা যদিও ঈসা মসীহ (আঃ) কে ভক্তি ও মান্য করার দাবীদার কিন্তু তাদের মধ্যে একদল ইহুদীদের মতই হযরত ঈসা (আঃ) এর ক্রুশ বিদ্ধ হওয়ার এবং মৃত্যুবরণ করার কথায় স্বীকৃতি প্রদান করে চরম মুর্খতার পরিচয় দিচ্ছে। তাদের আরেক দল অতিভক্তি দেখাতে গিয়ে হযরত ঈসা (আঃ) কে স্বয়ং খোদা বা খোদার পুত্র বলে ধারণা করে বসেছে।

কুরআন পাকের এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বর্তমানে যদিও হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রতি যথাযথ ঈমান রাখে না, বরং শৈথিল্য বা বাড়াবাড়ি করে, কিন্তু কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগে তিনি যখন পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, তখন এরাও তাঁর প্রতি পুরোপুরি ও সত্যিকার ঈমান আনবে। খ্রিস্টানরা মুসলমানদের মত সহীহ আকীদা ও বিশ্বাসের সাথে ঈমানদার হবে। ইহুদীদের মধ্যে যারা তার বিরুদ্ধাচারণ করবে তাদেরকে নিধন ও নিশ্চিহ্ন করা হবে। অবশিষ্টরা ইসলাম গ্রহণ করবে। ইহুদীরা ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করে না এবং হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। এমনকি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতেরও অস্বীকার করে। কিন্তু এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের দৃষ্টির সম্মুখে সত্য উন্মোচিত হবে, তখন তারা যথার্থই বুঝতে পারবে যে, হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে তাদের ধারণা একান্তই ভ্রান্তিপূর্ণ ছিল। তখন সমগ্র দুনিয়া থেকে সর্বপ্রকার কুফরী ধ্যান-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান উৎক্ষিপ্ত হবে। সর্বত্র ইসলামের একচ্ছত্র প্রাধান্য কায়েম হবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ) একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক রূপে অবশ্যই পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। তিনি দাজ্জালকে কতল করবেন, শুকর নিধন করবেন, ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন এবং জিজিয়া কর তুলে দিবেন। তখন একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা হবে এবং পৃথিবীতে কোন অন্যায়, অশান্তি ও অভাব-অভিযোগ থাকবে না।

# ভবিষ্যদ্বাণী - ছাব্বিশ

## আদী ইবনে হাতেম তায়ী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন ঃ "আমি নবীজীর সামনে বসে ছিলাম। এমন সময় একজন লোক এসে তার ক্ষুধার্ত অবস্থার কথা জানাল। অন্য একজন এসে ডাকাতি রাহাজানির অভিযোগ করল। নবী মোস্তফা (সাঃ) বললেনঃ হে আদী তুমি কি হীরা শহর দেখেছ ? যদি তোমার আয়ু হয় বেশি দিন তবে দেখতে পাবে যে ঘোড়ায় চড়ে একজন মহিলা হীরা থেকে আসবে এবং কাবাঘর তাওয়াফ করবে। এ সময়ে আল্লাহর ভয় ছাড়া তার অন্য কোন ভয় থাকবে না। যদি তুমি দীর্ঘজীবী হও, তবে দেখবে আঁচল ভরে সোনা বিতরণের জন্য নেয়া হবে, কিন্তু গ্রহণ করার লোক পাওয়া যাবেনা"। (বুখারী)

আল্লাহর রাসূল(সাঃ) যখন এ ভবিষ্যদ্বাণী করছিলেন তখন ইরান ছিল তৎকালীন বিশ্বের এক বিশাল শক্তিধর সাম্রাজ্য । আর মুসলমানদের সংখ্যা তখন খুবই নগণ্য ।

এ ঘটনার দীর্ঘদিন পরে আদী (রা:) বিগত দিনের কথা স্মরণ করে বললেন: আমি দেখেছি , হাওদাজে চড়ে আসা একজন মহিলা হীরা থেকে এসে কা'বা ঘর তওয়াফ করছে কিন্তু আল্লাহ ছাড়া তার অন্য কারো ভয় ছিল না। কিসরার ধন ভাণ্ডার যারা জয় করেছিলেন আমি নিজেই ছিলাম তাদের মধ্যে একজন। তোমরা যদি দীর্ঘজীবী হও তবে আবুল কাসেমের সেই কথার সত্যতার প্রমাণও মিলবে, তিনি বলেছিলেন, এমন এক সময় আসবে যখন আঁচল ভরে বিতরণের জন্য সোনা নেয়া হবে কিন্তু তা গ্রহণের লোক পাওয়া যাবেনা।

এঘটনা সত্য হয়েছিল পঞ্চম খলিফা হযরত উমর বিন আ: আজিজের শাসনামলে। আদি ইবনে হাতেম (রা:) বিখ্যাত দাতা হাতেম তাই এ পুত্র। রাসূলুল্লাহ (সা:) থেকে তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন নিঃসন্দেহে তা সত্য। কেবল তিনি নন, রাসূলুল্লাহ (সা:) এর দেড় লক্ষাধিক সাহাবীর কেউই ইসলাম গ্রহণের পর কোনদিন মিথ্যা বলেননি। এমন সত্যবাদী সমাজ যা নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা:) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তা বিরল।

# ভবিষ্যদ্বাণী - সাতাশ

## নানা রকম যানবাহন আবিষ্কৃত হবে

পবিত্র কুরআনের সূরা নাহল এর ৮নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমাদের আরোহণের জন্য এবং শোভার জন্য তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি এমন যানবাহন সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জাননা।"

উল্লেখিত আয়াতে তৎকালীন যুগের মানুষের স্থলপথের তিনটি বাহন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই সূরার ১২ নং আয়াতে জলযানের (জাহাজ বা নৌকা) কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ কয়টি ছিল কুরআন নাজিল হওয়ার সময় পর্যন্ত মানুষের প্রধান বাহন। সে যুগের মানুষের বর্তমান যুগে আবিস্কৃত যানবাহন মোটরগাড়ি, ট্রেন, উড়োজাহাজ, রকেট ইত্যাদি সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। তারা জানতো না যে ভবিষ্যতে কী কী যানবাহন আবিষ্কার হবে। এ সব যানবাহন আবিষ্কার হবার প্রায় ১৩০০ বছর পূর্বেই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন। এছাড়া ভবিষ্যতেও যে সব যানবাহন আবিস্কৃত হবে সেগুলোও এর অর্ন্তভূক্ত।

কুরআনের বর্ণনা ভঙ্গী থেকে জানা যায়, এ সব যানবাহন মানুষ সৃষ্টি করেনি। এগুলো আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। কারণ এ সব যানবাহনের কলকব্জা (Parts) তৈরি করা হয়েছে প্রকৃতি সৃজিত ধাতব পদার্থ দিয়ে। বিজ্ঞানীরা তাতে প্রকৃতি প্রদত্ত বায়ু, পানি, অগ্নি ইত্যাদি থেকে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি করেছে কিংবা প্রকৃতি প্রদত্ত জ্বালানি তেল এসব যানবাহনে ব্যবহার করেছে। প্রাচীন বা আধুনিক বিজ্ঞান একজোট হয়েও কোন লোহা, তামা ইত্যাদি ধাতব পদার্থ তৈরি করতে পারে না। এমনি ভাবে বায়ু, পানি, আগুন ইত্যাদি সৃষ্টি করাও তাদের সাধ্যের অতীত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, সামান্য একটি মাছিও তৈরি করার সাধ্য কারো নাই। কাজেই সামান্য চিন্তা করলেই একথা স্বীকার করতে হয় যে, যাবতীয় আবিষ্কার প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, পূর্বোক্ত সব বস্তুর সৃষ্টির ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের অতীত কাল ব্যবহৃত হয়েছে এবং অন্যান্য যানবাহনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ পদবাচ্য ব্যবহার করা হয়েছে। ক্রিয়াপদের এ পরিবর্তন থেকে ফুটে উঠেছে যে, এ আয়াত নাজিল হওয়ার সময় পর্যন্ত ঐ সমস্ত যানবাহনের অস্তিত্ব ছিল না যা পরবর্তীতে আবিস্কৃত হয়েছে অথবা ভবিষ্যতে আবিস্কৃত হবে।

# ভবিষ্যদ্বাণী - আটাশ

## সুরাকা ইবনে মালেক সম্রাট কেসরার পোশাক পরিধান করবে

প্রতিমা পূজারীদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে চলেছেন মদীনার পথে। কিন্তু দুশমনও পিছু ধাওয়া করে চলেছে তাঁর। কি হবে এখন? পারবেন কি তিনি ওদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে মদীনায় পৌঁছাতে?

ধাওয়াকারীদের চোখ ফাঁকি দিতে একপর্যায়ে নবীজী আশ্রয় নিলেন মক্কার কাছের এক পাহাড়ি গুহায়। আল্লাহর রহমতে সেবার দুশমন তাঁর খুব কাছে পৌঁছেও দেখতে পেলেন না যে, তিনি সেখানে আছেন। কিন্তু ওরা বুঝতে পারছিল নবীজী তখনও খুব বেশী দূর যেতে পারেননি।

তাই নবীজী যেন কোনভাবেই মদীনা পৌঁছাতে না পারেন, এজন্য ধাওয়াকারী মুশরিকরা মক্কা-মদীনার মাঝামাঝি যেসব মানুষেরা থাকত, তাদের মাঝে ঘোষণা করে

দিলঃ কোন ব্যক্তি মুহাম্মাদকে জীবিত বা মৃত যে কোন অবস্থায় ধরে দিতে পারলে তাকে একশ'টি উন্নত জাতের উট পুরস্কার দেয়া হবে।

ঘোষণাটি অনেকের মত শুনতে পেল সুরাকা ইবন মালিক। সে তখন এক আড্ডায় বসে ছিল। ঘোষণাটি শুনে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারল না সুরাকা। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ঝুঁকি নেবে সে। আবার নিজের ইচ্ছার কথা বলে ফেললে আরও কেউ সঙ্গী হতে চাইবে তার, এ আশঙ্কায় চুপচাপ রইল।

সুরাকার মত অপর একজনও আগ্রহী হয়ে উঠল নবীজীর পিছু ধাওয়া করতে। সে বললঃ আল্লাহর শপথ, আমার পাশ দিয়ে এখনই তিন জন লোক চলে গেল। আমার ধারণা তারা মুহাম্মাদ, আবু বকর ও তাদের গাইডই হবে।

কি সর্বনাশ! এ লোক টের পেয়ে গেলে তো সেও পিছু ধাওয়া করতে চাইবে! একে ঠেকাতে তাই সুরাকা বললঃ না, তা নয়। তারা হচ্ছে অমুক গোত্রের লোক। তাদের উট হারিয়ে গেছে, তাই তারা উটের খোঁজে বেরিয়েছে।

তা হতে পারে– এ কথা বলে আগ্রহী লোকটি চুপ করে গেল।

আড্ডা থেকে ঘোষণা শুনেই উঠে পড়লে অন্যেরা সন্দেহ করবে, এ কারণে সে আরও কিছুক্ষণ সেখানে বসে রইল। এরপর এক ফাঁকে আড্ডা থেকে উঠে বাড়ির পথ ধরল সুরাকা। চোখে তার চকচকে লোভ। একশ' উটের লোভনীয় পুরস্কারের হাতছানি তখন তার হৃদয়-মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

বাড়ি গিয়ে দাসীকে বললোঃ তুমি চুপি চুপি কেউ না দেখে এমনভাবে অমুক জায়গায় গিয়ে আমার ঘোড়াটি বেঁধে রেখে আসবে। আর দাসকে বললোঃ তুমি এ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাড়ির পেছনে দিক থেকে চুপচাপ বেরিয়ে যাবে, যেন কেউ টের না পায়। এরপর দাসী যেখানে ঘোড়াটি রেখে দেবে, তার আশেপাশে একস্থানে এসব অস্ত্র রেখে দেবে।

এবার সুরাকাও পৌঁছে গেল ঘোড়া-অস্ত্রশস্ত্রের কাছে। বর্ম পরে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোড়ায় চেপে সে রওয়ানা হল নবীজীকে ধরতে। চোখে তার রঙিন স্বপ্ন।

সুরাকা ছিল বিশালদেহী পুরুষ। মরুভূমিতে কারো পায়ের ছাপ খুঁজে পেতে তার তুলনা মেলা ভার। ঈগলের মত তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। যেমন সাহসী যোদ্ধা সে, তেমনই ধৈর্যশীল। তার ঘোড়াটাও খুব উন্নতজাতের। আর সেও দক্ষ ঘোড়-সওয়ার। এমন একজন মানুষ এক শ' উট পুরস্কার অর্জনের চ্যালেঞ্জ নিতেই পারে।

কিন্তু সে কি জানত, কার পিছু ধাওয়া করতে চলেছে সে?

এগিয়ে চলেছে সুরাকা। হঠাৎ ঘোড়া হোঁচট খেলো আর দক্ষ অশ্বারোহী সুরাকা ছিটকে পড়ে গেল। কেন এমন হল! এটাকে মোটেই শুভ লক্ষণ মনে হল না তার কাছে। বললঃ একি? ওরে ঘোড়া তুই নিপাত যা! এই বলে সে আবার ঘোড়ার পিঠে উঠল। কিছু দূর যেতে না যেতেই ঘোড়াটি আবার হোঁচট খেলো। এবার তার অশুভ লক্ষণের কথা আরও বেশি মন পড়তে লাগল।

একবার মনে মনে বললঃ 'ফিরে যাই'। কিন্তু এক শ' উটের পুরস্কার! নাহ্, এগিয়ে যাই।

দ্বিতীয়বার ঘোড়াটি যেখানে হোঁচট খেয়েছিল সেখান থেকে সামান্য দূরে সে দেখতে পেল আল্লাহর রাসূল (সা) ও তাঁর দু'সঙ্গীকে। সঙ্গে সঙ্গে সে তার হাত ধনুকের দিকে বাড়ালো। কিন্তু সে হাতটি যেন একেবারে প্যারালাইসড, অসাড়। আর বাড়ানো যাচ্ছে না।

সে দেখতে পেল, তার ঘোড়ার পা যেন শুকনো মাটিতে দেবে যাচ্ছে এবং সামনে থেকে প্রচ ধোঁয়া উঠে ঘোড়া ও তার চোখ অন্ধকার করে ফেলছে। সে তাড়াতাড়ি ঘোড়াটি হাঁকানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু ঘোড়াটি এমন স্থির হয়ে পড়ল যে, তার মনে হলঃ ঘোড়ার পা যেন কেউ লোহার পেরেক দিয়ে আটকে দিয়েছে।

প্রচণ্ড রকম ভয় পেয়ে গেল সুরাকা। বুঝতে পারল, সাধারণ কারোর পিছু ধাওয়া সে করেনি। কিভাবে সে মুক্তি পাবে এ বিপদ থেকে? পুরস্কারের লোভ যে তাকে এখন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

ভীত-সন্ত্রস্ত সুরাকা চেঁচিয়ে মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললঃ 'ওহে! তোমরা তোমাদের প্রভুর দরবারে আমার ঘোড়ার পা মুক্ত হওয়ার জন্য দু'আ কর। আমি তোমাদের অকল্যাণ করবো না'।

মুহাম্মাদ (সাঃ) কিন্তু ধাওয়া করে আসা সুরাকাকে হাতের মুঠোয় পেয়ে শাস্তি দিলেন না। বরং তার জন্য দুআ করলেন।

সুরাকা ও তার ঘোড়া মুক্ত হয়ে গেল। সাথে সাথেই আবার তার মধ্যে একশ' উটের লালসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। আবারও সে ঘোড়া হাঁকাতে চাইল নবীজীর দিকে।

এবার আগের বারের চাইতেও মারাত্মকভাবে ঘোড়ার পা মাটিতে আটকে গেল। এবারও সে ভয় পেয়ে আগের মত নবীজীর (সাঃ) সাহায্য কামনা করে বললঃ 'আমার এ খাবার-দাবার, আসবাবপত্র, অস্ত্রশস্ত্র সবই তোমরা নিয়ে যাও। আমি আল্লাহর নামে শপথ করছি, মুক্তি পেলে আমি আমার পেছনে ধেয়ে আসা লোকদের তোমাদের থেকে অন্য দিকে হটিয়ে দেব।'

নবীজীর সাথে ছিলেন আবুবকর (রাঃ) ও একজন গাইড। তাঁরা বললেনঃ 'তোমার খাবার ও আসবাবপত্রের প্রয়োজন আমাদের নেই। তবে তুমি লোকদের আমাদের থেকে দূরে হটিয়ে দেবে।

এরপর নবীজী (সাঃ) সুরাকার জন্য দু'আ করলেন। আগের মত এবারও ঘোড়াটি মুক্ত হয়ে গেল। এবার সে আর পিছু ধাওয়া না করে ফিরে যেতে চাইল। কিন্তু যাদের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে এত ঘটনা, তাদের সাথে কিছু কথা না বলেই চলে যাবে তা কি করে হয়। তাই সে নবীজীদের দিকে ফিরে বললঃ আপনারা একটু থামুন,

আপনাদের সাথে আমি কিছু কথা বলতে চাই। আল্লাহর কসম, আপনাদের কোন ক্ষতি আমি করবো না।

নবীজী (সাঃ) ও আবু বকর (রাঃ) একসাথে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি আমাদের কাছে কি চাও?

সে বললোঃ আল্লাহর কসম, হে মুহাম্মদ, আমি নিশ্চিতভাবে জানি শিগগিরই আপনার দ্বীন বিজয়ী হবে। আমার সাথে আপনি ওয়াদা করুন, আমি যখন আপনার সাম্রাজ্যে যাব, আপনি তখন আমাকে সম্মান দেবেন। আর একথাটি একটু লিখে দিন।

নবীজী (সাঃ) আবুবকরকে লিখতে বললেন। তিনি একখণ্ড হাড়ের উপর কথাগুলি লিখে তার হাতে দিলেন।

সুরাকা ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে, এমন সময় আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাকে বললেনঃ সুরাকা, তুমি যখন কিসরার (ইরান সম্রাট) রাজকীয় পোশাক পরবে, তখন কেমন হবে?

এ কথা শুনে সুরাকার তো বিস্ময়ের আর সীমা-পরিসীমা নেই। কেননা ইরান সাম্রাজ্য ছিল সেই সময়ের দুনিয়ার সবচাইতে শক্তিশালী সাম্রাজ্য । সীমাহীন সম্পদ আর লাখ লাখ সুসজ্জিত সৈন্যের অধিকারী। ইরান সম্রাটের পোশাক পরবে আরবের সামান্য এক মরুচারী-এটা ভাবতেই পারেনি সুরাকা।

বিস্ময়ে হতভম্ব সুরাকা নিশ্চিত হওয়ার জন্য জানতে চাইলোঃ কিসরা ইবন হুরমুয?

রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ হ্যাঁ । কিসরা ইবন হুরমুয।

কি অবাক করা কান্ড! একশ' উটের পুরস্কারের লোভে যাকে ধাওয়া করে এসেছে, সে কিনা হাতের মুঠোয় পেয়েও তাকে ছেড়ে দিল। শুধু তাই নয় ইরান রাজার পোশাক পুরস্কার পাবার মতো বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণীও করে গেল। এ তো কল্পনারও অতীত!

যাহোক সুরাকা পেছনে ফিরে চলে গেল। ফেরার পথে সে দেখতে পেল লোকেরা তখনও রাসূল (সাঃ)-কে অনুসন্ধান করে ফিরছে। সে তাদেরকে বললোঃ 'তোমরা ফিরে যাও। আমি এ অঞ্চলে বহুদূর পর্যন্ত তাঁকে খুঁজেছি। আর তোমরা তা জানো পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করার ব্যাপারে আমার যোগ্যতা কতখানি।'

তার এ কথা শুনে ধাওয়াকারীরা ফিরে গেল। সে-ও পুরো ব্যাপারটা চেপে গেল। যখন সে স্থির বিশ্বাসে পৌঁছে গেল যে, এতদিন নবীজী মদীনা পৌঁছে কুরাইশদের শত্রুতা থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছেন, তখন সে তার ঘটনাটি সবার সামনে বলল।

নবীজীর সঙ্গে সুরাকার ঘটনার কথা অন্যদের মত আবু জাহেলের কানেও গেল। সুযোগ পেয়েও হাতছাড়া করার জন্য আবু জাহল সুরাকাকে কঠিনভাবে তিরস্কার করল। সুরাকাও ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। সে কবিতায় এর জবাব দিল। সে আবৃত্তি করলঃ

'আল্লাহর শপথ, তুমি যদি দেখতে আবু হিকাম,
আমার ঘোড়ার ব্যাপারটি, যখন তার পা দেবে যাচ্ছিল, তুমি জানতে
এবং তোমার কোন সন্দেহ থাকতো না, মুহাম্মাদ প্রকৃত রাসূল–
সুতরাং কে তাঁকে প্রতিরোধ করে?'

সময় বয়ে চলল। একদিন যে মুহাম্মাদ (সাঃ) রাতের আঁধারে মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরাত করেছিলেন, তিনি আজ বিজয়ীর বেশে মক্কায় এসেছেন হাজার হাজার সশস্ত্র মুজাহিদ নিয়ে। আর অত্যাচারী-অহঙ্কারী কুরাইশ সরদাররা আজ করুণা ভিক্ষার জন্য ভীড় জমাচ্ছে নবীজীর কাছে।

অন্যদের মত সুরাকাও এল। সাথে তার দশ বছর আগে অঙ্গীকার লেখা হাড়টিও রয়েছে। অতি কষ্টে নবীজীর কাছে পৌঁছে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি সুরাকা ইবন মালিক। আর এই হলো আপনার অঙ্গীকার পত্র।

নবীজী (সাঃ) বললেনঃ 'সুরাকা আমার কাছে এসো, আজ প্রতিশ্রুতি পূরণ ও সদ্ব্যবহারের দিন'। এরপর সুরাকা নবীজীর কাছাকাছি গিয়ে ঈমান আনার ঘোষণা দেন।

সময় আরও বয়ে চলল। নবীজী (সাঃ) ইন্তেকাল করলেন। সুরাকা এ মৃত্যুতে অত্যন্ত ব্যথিত ও শোকাভিভূত হয়ে পড়ল। একশ'টি উটের লোভে যেদিন নবীজী হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সে দিনটির কথা ঘুরে ফিরে তার স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠতে থাকে। এখন পৃথিবীর সকল উট নবীজীর নখাগ্রের সমানও নয়।

তিনি নবীজীর সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি বার বার স্মরণ করতেনঃ 'সুরাকা, যেদিন তুমি কিসরার পোশাক পরবে, কেমন হবে'। কিসরার পোশাক যে সত্যি সত্যি তিনি পরবেন সে ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

সময় এগিয়ে গেল আরও অনেক দূর। প্রথম খলিফা আবু বকর (রাঃ) ইরান অভিযান আরম্ভ করলেন। তৎকালীন বিশ্বের সুপার পাওয়ার পারস্য সাম্রাজ্যের বিশাল দুনিয়া কাঁপানো সেনাবাহিনীর সাথে মুসলিম মুজাহিদদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলতে লাগল। জানবাজ মুসলিম মুজাহিদগণ বহু রক্তের বিনিময়ে বীর বিক্রমে পারস্য সেনাবাহিনীর সকল প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দিতে থাকলেন।

দ্বিতীয় খলিফা উমার (রাঃ)-এর খেলাফতের সময় ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম মুজাহিদরা পারস্য রাজ্যের সকল প্রতিরোধ উড়িয়ে দিয়ে এক সময় তাদের রাজধানী মাদায়েনও দখল করে ফেললেন। ইরানের হাজার বছরের রাজ সিংহাসন এখন মুজাহিদদের পদতলে।

এ বিরাট বিজয়ের সংবাদ নিয়ে মুজাহিদ সেনাপতি সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাসের (রাঃ) এর দূত পৌঁছুল মদীনায়। সঙ্গে তার গনীমাতের সম্পদ। একসাথে যখন রাখা হল বিশাল এক স্তুপে পরিণত হল সেসব।

সম্পদের এ স্তুপের দিকে তাকিয়ে ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রচণ্ড ক্ষমতাধর শাসক উমার ফারুক (রাঃ) বিস্ময়ের সাথে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। এ সম্পদের মধ্যে ছিল

কিসরার (ইরান সম্রাট) মহা মূল্যবান মণি-মুক্ত খচিত মুকুট, সোনার জরি দেয়া কাপড়, মুক্তার হার এবং তার এমন চমৎকার দু'টি জামা যা এর আগে তিনি কখনও দেখেননি। আরও কত কি!

হাতের লাঠিটি দিয়ে খলীফা এসব সম্পদ উল্টে পাল্টে দেখছিলেন আর উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্য বলছিলেনঃ যারা এসব জিনিস থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে জমা দিয়েছে, নিশ্চয় তারা অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন হযরত আলী (রাঃ) । তিনি বললেনঃ আমীরুল মুমিনীন (বিশ্বাসীদের নেতা)! আপনি বিশ্বাস ভঙ্গ করেন নি, আপনার প্রজারাও বিশ্বাস ভঙ্গ করেনি। আপনি যদি অন্যায়ভাবে খেতেন, তাহলে তারাও খেত।

এতদিন পরে এল সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূরণের দিনটি। খলীফা সুরাকা ইবন মালিককে ডেকে আনলেন। নিজ হাতে তিনি কিসরার জামা, পাজামা, জুতো ও অন্যান্য পোশাক পরিয়ে দিলেন তাঁর শরীরে। কাঁধে ঝুলিয়ে দিলেন কিসরার তরবারি, কোমরে বেঁধে দিলেন বেল্ট, মাথায় রাখলেন মুকুট আর হাতে পরিয়ে দিলেন রাজকীয় ব্রেসলেট। খলীফা উমার সুরাকাকে পরিয়ে দিচ্ছেন কিসরার পোশাক, আর এদিকে মুসলমানদের মুহুর্মুহু 'আল্লাহু আকবার' আওয়াজে মদীনার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠছে। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে আল্লাহর রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী আবারও সত্য প্রমাণিত হলো।

কিসরার পোশাক পরা শেষ হলে সুরাকার দিকে ফিরে উমার (রাঃ) বললেনঃ সাবাশ, সাবাশ, মুদলাজ গোত্রের এক বেদুঈনের মাথায় শোভা পাচ্ছে শাহানশাহ কিসরার মুকুট আর হাতে বালা'।

তারপরে খলীফা আসমানের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ হে আল্লাহ! এ সম্পদ তুমি আল্লাহর রাসূলকে (সাঃ) দাও নি অথচ তিনি ছিলেন তোমার কাছে আমার থেকে বেশী প্রিয় ও সম্মানিত। তুমি দাও নি এ সম্পদ আবু বকরকেও। তিনিও ছিলেন তোমার নিকট আমার থেকেও অধিকতর প্রিয় ও মর্যাদাবান। আর তা দান করছ আমাকে পরীক্ষার জন্য। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই।

এরপর তিনি সূরা মুমিনুনের এ আয়াত দু'টি তেলাওয়াত করলেন ঃ

'তারা কি মনে করে, আমি তাদেরকে সাহায্য হিসেবে যে ধন-সম্পদ ও ছেলে-মেয়ে দান করি, তা দিয়ে তাদের সকল প্রকার মঙ্গল এগিয়ে নিয়ে আসছি? না, তারা বুঝে না।' (৫৫-৫৬)

খলীফা এ সম্পদকে নিজের সম্পদ তো মনে করেনইনি, এ সম্পদের প্রতি তার বিন্দুমাত্র লোভও জন্মেনি। এমনকি তিনি সকল সম্পদ মুসলমানদের মাঝে বণ্টন শেষ করে, তবেই সেখান থেকে উঠলেন। (আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, ১ম খন্ড)

সুরাকা (রা) যেভাবে আল্লাহর রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য হিসেবে পেয়েছেন, তেমিন আমাদের জন্যও রয়েছে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী-যা রয়েছে কুরআন-

হাদীসের পাতায় পাতায়। আজ নিজেদেরই প্রয়োজনে সেসব ভবিষ্যদ্বাণী জেনে নিতে হবে কুরআন-হাদীস থেকে, যেন আমরাও আমাদের জীবনে সেসব ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত করতে পারি। মহান আল্লাহ আমাদের সে সুযোগ দান করুন।

# ভবিষ্যদ্বাণী - ঊনত্রিশ

## কিয়ামতের পূর্বে হিংস্র জন্তুও মানুষের সাথে কথা বলবে

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না হিংস্র প্রাণী মানুষের সাথে কথা বলবে, যতক্ষণ না কোন ব্যক্তির চাবুকের মাথা এবং জুতার ফিতা তার সাথে বাক্যালাপ করবে এবং তার উরুদেশ বলে দিবে তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবার কি করেছে।(তিরমিযী)

কিয়ামতের কিছু কাল পূর্বে এ ধরণের বেশ কিছু সুস্পষ্ট কিয়ামতের আলামত প্রকাশিত হবে। বিভিন্ন হদীসে এ সব আলামতের বর্ণনা পাওয়া যায়।

# ভবিষ্যদ্বাণী - ত্রিশ

## কিয়ামতের পূর্বে পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে

হাদীস ঃ আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাত যখন পনরটি বিষয়ে লিপ্ত হবে তখন তাদের উপর বিপদ-মুসীবত আপতিত হবে। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সেগুলো কী কী? তিনি বললেনঃ যখন গানীমাতের মাল ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হবে, আমানত লুটের মালে পরিণত হবে, যাকাত জরিমানারূপ গণ্য হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে এবং তার মায়ের অবাধ্য হবে, বন্ধুর সাথে সদ্ব্যবহার করা হবে কিন্তু পিতার সাথে দুর্ব্যবহার করা হবে, মসজিদে শোরগোল করা হবে, সবচাইতে নিকৃষ্ট চরিত্রের লোক হবে তার সম্প্রদায়ের নেতা। কোন লোককে তার অনিষ্টতার ভয়ে সম্মান করা হবে, মদ পান করা হবে, রেশমী বস্ত্র পরিধান করা হবে, নর্তকী-গায়িকাদের প্রতিষ্ঠিত করা হবে, বাদ্যযন্ত্রসমূহের কদর করা হবে এবং এই উম্মাতের

শেষ যামানার লোকেরা তাদের পূর্বযুগের লোকদের অভিসম্পাত করবে। তখন তোমরা একটি অগ্নিবায়ু অথবা ভূমিধস অথবা চেহারা বিকৃতির আযাবের অপেক্ষা করবে।"

সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে এখন পুরুষদের অনেক ক্ষেত্রেই তার স্ত্রীর আনুগত্য করতে হচ্ছে। অপরাপর হাদীস থেকে জানা যায় যে, স্ত্রীলোকের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এমন এক পর্যায় আসবে যখন স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের চল্লিশ গুণ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। সুতরাং তখন পুরুষদের অবস্থা কি হবে তা সহজেই অনুমেয়।

উপরের হাদীসে কিয়ামতের পূর্বে ঘটবে এরকম পনেরটি ছোট আলামতের কথা বর্ণিত হয়েছে। অপরাপর হাদীসে আরও অনেক বড় আলামতের কথা জানা যায় যা আরও পরে কিয়ামতের প্রাককালে ঘটবে। যেমনঃ (১) পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে। (২) ইয়াজুজ ও মাজুজের আত্মপ্রকাশ ঘটবে, (৩) দাব্বাতুল আরদ নামক প্রাণীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে-যে তখনকার প্রত্যেক লোকের সাথে সাক্ষাত করবে, (৪) তিনটি ভূমিধস হবেঃ একটি প্রাচ্যে, একটি পাশ্চাত্যে এবং একটি আরব উপদ্বীপে, (৫) ইয়ামনের অন্তর্গত আদন (এডেন)-এর একটি গভীর কূপ থেকে অগ্নুৎপাত হবে, যা মানুষকে তাড়িয়ে নেবে বা একত্র করবে, তারা যেখানে রাত যাপন করবে আগুনও সেখানে রাত কাটাবে এবং তারা যেখানে দিনের বেলায় বিশ্রাম করবে, আগুনও সেখানেই বিশ্রাম করবে।

# ভবিষ্যদ্বাণী - একত্রিশ
## দাজ্জালের আবির্ভাব হবে

হাদীসঃ আন-নাওয়াস ইবনে সামআন আল-কিলাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা প্রত্যূষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি এর ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতা তুলে ধরেন। এমনকি আমাদের ধারণা জন্মাল যে, সে হয়ত খেজুর বাগানের ওপাশেই উপস্থিত রয়েছে। রাবী বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে চলে গেলাম, অতঃপর বিকালে আবার হাযির হলাম। তিনি আমাদের মধ্যে দাজ্জালের ভীতির আলামত দেখে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কি হয়েছে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সকালে আপনি দাজ্জালের আলোচনা করেছেন এবং এর ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতা এমন ভাষায় তুলে ধরেছেন যে, আমাদের মনে হচ্ছিল যে, সে বোধ হয় খেজুর বাগানের পাশেই উপস্থিত আছে। তিনি বলেনঃ দাজ্জাল ছাড়াও তোমাদের ব্যাপারে আমার আরও কিছুর আশংকা আছে। আমার জীবদ্দশায় সে যদি তোমাদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করে তবে

আমিই তোমাদের পক্ষে তার প্রতিপক্ষ হব। আর আমার অবর্তমানে যদি সে প্রকাশিত হয়, তাহলে তোমরাই তার প্রতিপক্ষ হবে। আর প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আল্লাহই আমার পরিবর্তে সহায় হবেন। সে (দাজ্জাল) হবে কুঞ্চিত চুলবিশিষ্ট, স্থির দৃষ্টিসম্পন্ন যুবক, সে হবে আব্দুল উযযা ইবনে কাতান সদৃশ। তোমাদের মধ্যে কেউ তার সাক্ষাত পেলে সে যেন সূরা কাহ্ফ-এর প্রাথমিক আয়াতগুলো পাঠ করে। তিনি বলেনঃ সে আত্মপ্রকাশ করবে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী কোন অঞ্চল থেকে। অতঃপর সে ডানে-বামে ফিতনা ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দৃঢ়তার সাথে অবস্থান করবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ রাসূল, সে পথিবীতে কতদিন অবস্থান করবে? তিনি বলেন ঃ চল্লিশ দিন। এর এক দিন হবে এক বছরের সমান, এক দিন হবে এক মাসের সমান এবং এক দিন হবে এক সপ্তাহের সমান, আর বাকী দিনগুলো তোমাদের বর্তমান দিনের সমান হবে। রাবী বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি মনে করেন, যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, তাতে এক দিনের নামায আদায় করলেই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বলেন ঃ না, বরং তোমরা সে দিনের সঠিক অনুমান করে নেবে (এবং তদনুযায়ী নামায পড়বে) । আমরা আবার জিজ্ঞেস করলাম, পৃথিবীতে তার চলার গতি দ্রুত হবে? তিনি বলেনঃ তার গতি হবে বায়ুচালিত মেঘের ন্যায়; অতঃপর সে কোন জাতির কাছে গিয়ে তাদেরকে নিজের দলে আহবান করবে, কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করবে এবং তার দাবি প্রত্যাখান করবে। সে তখন তাদের নিকট থেকে প্রস্থান করবে এবং তাদের ধন-সম্পদও তার পেছনে পেছনে চলে আসবে। পরদিন সকালে তারা নিজেদেরকে নিঃস্ব অবস্থায় পাবে। অতঃপর সে আরেক জাতির নিকট গিয়ে আহবান করবে। তারা তার আহবানে সাড়া দিবে এবং তাকে সত্য বলে গ্রহণ করবে। তখন সে আসমানকে বৃষ্টি বর্ষাতে আদেশ করবে এবং তদনুযায়ী বৃষ্টি বর্ষিত হবে। অতঃপর সে জমিনকে ফসল উৎপাদনের নির্দেশ দিবে এবং তদনুযায়ী ফসল উৎপাদিত হবে। অতঃপর বিকেলে তাদের পশুপালনগুলো পূর্বের চেয়ে উঁচু কুঁজবিশিষ্ট, মাংসবহুল নিতম্ববিশিষ্ট ও দুগ্ধপুষ্ট স্তনবিশিষ্ট হবে। অতঃপর সে নির্জন পতিত ভূমিতে গিয়ে বলবে, তোর ভেতরের খনিজ ভান্ডার বের করে দে। অতঃপর সে সেখান থেকে প্রস্থান করবে এবং সেখানকার ধনভান্ডার তার অনুসরণ করবে যেভাবে মৌমাছিরা রাণী মৌমাছির অনুসরণ করে। অতঃপর সে পূর্ণযৌবন এক তরুণ যুবককে তার দিকে আহবান করবে। তাকে সে তরবারির আঘাতে দুই টুকরা করে ফেলবে। অতঃপর সে তাকে ডাক দিবে. অমনি সে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সামনে এসে দাঁড়াবে। এমতাবস্থায় এদিকে দামিশকের পূর্ব প্রান্তের এক মসজিদের সাদা মিনারে হলুদ রংয়ের দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় দু'জন ফেরেশতার ডানায় ভর করে ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) অবতরণ করবেন। তিনি তাঁর মাথা নিচু করলে ফোঁটায়, ফোঁটায় এবং উচুঁ করলেও মনিমুক্তার ন্যায় (ঘাম) পড়তে থাকবে। তাঁর নিঃশ্বাস যাকেই স্পর্শ করবে সে মারা যাবে; আর তাঁর শ্বাস বায়ু দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছবে। অতঃপর তিনি দাজ্জালকে

অনুসন্ধান করবেন এবং তাকে 'লুদ্দ' এর নগরদ্বারপ্রান্তে পেয়ে হত্যা করবেন। তিনি বলেনঃ আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী এভাবে তিনি অতিবাহিত করবেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর কাছে ওহী পাঠাবেনঃ "আমার বান্দাদেরকে তুর পাহাড়ে সরিয়ে নাও। কেননা আমি এমন একদল বান্দা নাযিল করছি যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কারো নেই।" তিনি বলেন, অতঃপর আল্লাহ ইয়াজুজ-মাজুজের দল পাঠাবেন। আল্লাহ তাআলার বাণী অনুযায়ী তাদের অবস্থা হল, "তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে।" (সূরা আম্বিয়াঃ ৯৬) তিনি বলেন, তাদের প্রথম দলটি (সিরিয়ার) তাবারিয়া উপসাগর অতিক্রমকালে এর সমস্ত পানি পান করে শেষ করে ফেলবে। এখান দিয়ে এদের শেষ দলটি অতিক্রমকালে বলবে, এই জলাশয়ে নিশ্চয়ই কোনকালে পানি ছিল। অতঃপর বায়তুল মাকদিসের পাহাড়ে পৌঁছে তাদের অভিযান শেষ হবে। তারা পরস্পর বলবে, আমরা তো পৃথিবীর বাসিন্দাদের শেষ করেছি, এবার চল আসমানের বাসিন্দাদের শেষ করি। এই বলে তারা আসমানের দিকে তীর ছুড়বে। আল্লাহ তাদের তীরসমূহ রক্ত রঞ্জিত করে ফেরত দিবেন। অতঃপর ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) ও তাঁর সাথীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন। তারা (খাদ্যভাবে) এমন এক কঠিন অবস্থায় পতিত হবেন যে, তখন তাদের জন্য একটা গরুর মথা তোমাদের এ যুগের একশত দীনারের চাইতে বেশী উত্তম মনে হবে। তিনি বলেন, অতঃপর ঈসা (আঃ) ও তাঁর সাথীরা আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে দোয়া করবেন। আল্লাহ তখন তাদের (ইয়াজুজ-মাজুজ বাহিনীর) ঘাড়ে মহামারীরূপে 'নাগাফ' নামক কীটের উদ্ভব করবেন। অতঃপর তারা এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে যেন একটি প্রাণের মৃত্যু হয়েছে। তখন ঈসা (আঃ) তার সাথীদের নিয়ে (পাহাড় থেকে) নেমে আসবেন। তিনি সেখানে এমন এক বিঘত জায়গাও পাবেন না, যেখানে সেগুলোর পঁচা দুর্গন্ধময় রক্ত-মাংস ছড়িয়ে না থাকবে। অতঃপর তিনি সাথীদের নিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন। আল্লাহ তখন উটের ঘাড়ের ন্যায় লম্বা ঘাড়বিশিষ্ট এক প্রকার পাখি পাঠাবেন। সেই পাখি ওদের লাশগুলো তুলে নিয়ে গভীর খাদে নিক্ষেপ করবে। মুসলমানগণ এদের পরিত্যক্ত তীর, ধনুক ও তূণীগুলো সাত বছর পর্যন্ত জ্বালানীরূপে ব্যবহার করবে। অতঃপর আল্লাহ এমন বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা সমস্ত ঘরবাড়ি, স্থলভাগ ও কঠিন মাটির স্তরে গিয়ে পৌছবে এবং সমস্ত পৃথিবী ধুয়েমুছে আয়নার মত ঝকঝকে হয়ে উঠবে। অতঃপর যমীনকে বলা হবে, তোর ফল ও ফসলসমূহ বের করে দে এবং বরকত ও কল্যাণ ফিরিয়ে দে। তখন অবস্থা এমন হবে যে, একদল লোকের জন্য একটি ডালিম যথেষ্ট হবে এবং একদল লোক এর খোসার ছায়াতলে আশ্রয় নিতে পারবে। দুধেও এমন বরকত হবে যে, বিরাট একটি দলের জ্যা একটি উটনীর দুধ, একটি গোত্রের জন্য একটি গাভীর দুধ এবং একটি ছোট দলের জন্য একটি ছাগলের দুধই যথেষ্ট হবে। এমতাবস্থায় কিছু দিন যাওয়ার পর হঠাৎ আল্লাহ এমন এক বাতাস পাঠাবেন যা সকল ঈমানদারের আত্মা ছিনিয়ে নেবে এবং অবশিষ্ট থাকবে কেবল দুশ্চরিত্রের লোক যারা গাধার ন্যায় প্রাকশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। অতঃপর তাদের উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে। (তিরমিযী)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দাজ্জাল মদীনায় উপস্থিত হয়ে দেখতে পাবে যে, ফেরেশতাগণ তা পাহারা দিচ্ছেন। অতএব আল্লাহর ইচ্ছায় মহামারী ও দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। (তিরমিযী)

# ভবিষ্যদ্বাণী - বত্রিশ
## হযরত ঈসা (আঃ) ও ইমাম মাহদী আবির্ভূত হবেন

আলোচ্য ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি এখনো কার্যকর হয়নি। কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ইসলাম ও মুসলমানদের উপর ইহুদী-খৃস্টান-মুশরিকদের অত্যাচার ও নির্যাতন যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছবে তখন ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং ইমাম মাহদী আত্ম প্রকাশ করবেন। এ সময় ইহুদী নেতা দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।

এদের কবল থেকে মুসলমানদেরকে উদ্ধার করে হযরত ঈসা (আঃ) ও ইমাম মাহদী পৃথিবীর বুকে ইসলামকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবেন ঠিক যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখন পৃথিবীতে ইহুদী, খ্রিস্টান, মুশরিক বা কোন অমুসলিম থাকবে না। সবাই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে মুসলিম হয়ে যাবে। তখন পৃথিবীতে কোন অশান্তি ও অভাব অনটন থাকবে না। থাকবে শুধু শান্তি আর শান্তি।

তবে এ শান্তি ও বিজয় অতি সহজে অর্জিত হয়ে যাবে না। কোন জাদু-মন্ত্র বলেও অর্জিত হবে না। ইমাম মাহদী ও ঈসা (আঃ) এর যোগ্য নেতৃত্বে বিশ্বের অধপতিত মুসলমানগণ আবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে জেগে উঠবে। তারা তাদের হারানো শক্তি পুনরুজ্জীবিত করে অমুসলিমদের সাথে লড়াই করে বিজয়ী হবে। এ লড়াই এর অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কেও একাধিক হাদীসের বর্ণনা রয়েছে। এ যুদ্ধে যেসব মুসলমান অংশ নিবে তারাই বেহেশতে যাবে; জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। এ যুদ্ধের শহীদদের মর্যাদা প্রথম যুগের শহীদদের মত হবে। এদসংক্রান্ত অসংখ্যা হাদীসের মধ্য থেকে ৩টি হাদীস এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ

ক) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের দু'টি সেনাদলকে আল্লাহ তাআলা দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। (১) যারা হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং (২) যারা ঈসা (আঃ) সাথে থাকবে এবং ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। (মুসনাদে আহমাদ)

খ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, মাহদী হবে আমার বংশের, উজ্জ্বল চেহারা ও উঁচু নাক বিশিষ্ট। তিনি (ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে) ন্যায় ইনসাফ দ্বারা এমনভাবে জমীনকে পরিপূর্ণ করে দিবেন যেমনভাবে তৎপূর্বে উহা জুলুম ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি সাত বছর শাসন ক্ষমতায় থাকবেন।

গ) নবী (সাঃ) বলেছেন, আমি ও তার (ঈসা) এর মাঝে কোন নবী নেই। তিনি নাযিল হবেন। যখন তোমরা তাঁকে দেখবে তখন তাঁকে চিনে নিও। তিনি হবেন মধ্যম আকৃতির লোক। লাল ও সাদা মিশ্রিত রং হবে তাঁর। তিনি ইসলামের জন্য জিহাদ করবেন। ক্রুশ ছিন্নভিন্ন করবেন। শুকর ধ্বংস করবেন। জিজিয়া কর রহিত করবেন। আল্লাহ তায়ালা ইসলাম ছাড়া সব মতবাদপন্থী জাতি ধ্বংস করবেন। তিনি (ঈসা আঃ) দাজ্জালকে হত্যা করবেন। তিনি চল্লিশ বছর দুনিয়ায় থাকবেন। অতপর তাঁর ইনতেকাল হলে মুসলমানগণ তাঁর জানাযার নামাজ পড়বে। (আবু দাউদ)

ঈসা (আঃ) ও মাহদী সম্পর্কে উক্ত বর্ণনাগুলো কুরআন, হাদীস ও উম্মতের ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এগুলো অস্বীকার করা ঈমানের পরিপন্থী। কেউ অস্বীকার করলে সে মুসলমান থাকবে না।

# ভবিষ্যদ্বাণী - তেত্রিশ

## একটি সামরিক বাহিনী ভূমিতে ধ্বসে যাবে

উম্মু সালমা (রা:) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা:) একটি সামরিক বাহিনী সম্পর্কে আলোচনা করলেন যারা ভূমিতে জীবন্ত ধসে যাবে। উম্মু সালমা (রা:) বলেন, হয়তো তাদের মধ্যে কিছু লোককে জবরদস্তি করে ভর্তি করা হয়ে থাকবে। তাদেরকে তাদের নিয়্যাত অনুযায়ী পুনরুত্থান করা হবে। (তিরমিযী)

এ ভবিষ্যদ্বাণীটি এখনো কার্যকর হয়নি। অর্থাৎ এরকম বিশাল কোন সেনাবাহিনী ভুমিতে ধসে যায়নি। পৃথিবীতে পুনরায় ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয়ের প্রাককালে মুসলিম বিরোধী কোন বিশাল সেনাবাহিনী ভুমিতে ধসে যাওয়ার ইঙ্গিত এ হাদীসটিতে রয়েছে।

# ভবিষ্যদ্বাণী - চৌত্রিশ
## জমিন তার সম্পদ উদগীরণ করে দিবে

হাদীস ঃ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (এমন এক সময় আসবে) যখন জমীন তার সোনা রূপার সমস্ত খনিজ ভান্ডার কলিজার টুকারার মত স্তুপাকার বের করে দিবে। তখন চোর এসে বলবে, এ সম্পদের কারণেই তো আমার হাত কাটা গেছে। ঘাতক (হন্তা) এসে বলবে, এ সম্পদের জন্যই তো আমি হত্যা করেছি। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এসে বলবে, এ সম্পদের কারণেই তো আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। অতঃপর তারা এ সম্পদ ছেড়ে যাবে, তা থেকে কিছুই নেবে না।

এ ভবিষ্যদ্বাণী টি সত্য হবে হযরত ঈসা (আঃ) ও ইমাম মাহদী আসার পর পৃথিবীতে যখন ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং নবুয়াতের পদ্ধতিতে ইসলামের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হবে।

# ভবিষ্যদ্বাণী - পঁয়ত্রিশ
## হিন্দুস্থানে জিহাদ হবে

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর আযাদকৃত দাস হযরত সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আমার উম্মাতের দুটি সেনাদলকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন– একটি সেনাদল যারা হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে অপর দলটি হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) এর সাথে থাকবে।"

অপর একটি হাদীস হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে হিন্দুস্থানে অভিযানের ওয়াদা করিয়েছিলেন। যদি আমার জীবদ্দশায় তা ঘটে তবে যেন আমার জান ও মাল এতে ব্যয় করি। যদি আমি এই যুদ্ধে নিহত হই তাহলে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদ হিসেবে পরিগণিত হবো। আর যদি জীবিত অবস্থায় ফিরে আসি তাহলে আমি জাহান্নাম থেকে মুক্ত আবু হুরাইরাহ হয়ে যাব।"

উপরোক্ত হাদীস দুটি সহীহ আন নাসায়ী ও মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে রয়েছে। পৃথিবীর মানচিত্রে ও ইতিহাসে হিন্দুস্থান অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। একারণেই হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) এর পবিত্র জবান থেকে আমাদের

এই উপমহাদেশ তথা হিন্দুস্থান এবং হিন্দুস্থানের জিহাদের কথা উচ্চারিত হয়েছে। সেই যুগে হযরত রাসুলে আকরাম (সা.) এর নিকটও হিন্দুস্থান সুপরিচিত ছিল। আরও দুয়েকটি হাদীসে তিনি হিন্দুস্থানের নাম উল্লেখ করেছেন।

পৃথিবীর প্রায় চার ভাগের এক ভাগ মানুষের বসতি এই হিন্দুস্থান যার প্রায় অর্ধেক লোক আল্লাহর সাথে শিরক করে থাকে অর্থাৎ মুশরিক। শিরক আল্লাহর নিকট সবচে বড় অপরাধ। আল্লাহ সব গুনাহ ক্ষমা করেন কিন্তু শিরকের গুনাহ ক্ষমা করেন না। এত বিপুল সংখ্যক মুশরিকের পাশাপাশি এই এলাকায় বাস করে প্রায় সমসংখ্যক মুসলিম। এদের মধ্যে আবির্ভাব হয়েছে বহু বড় বড় আলেম, মুহাদ্দিস, মুজাদ্দিদ, শহীদ, গাজী ও আল্লাহর অলীদের। হযরত শাহজালাল, শাহমাখদুম, মঈনুদ্দিন চিশতি, সাইয়িদ আহমদ দেবলভী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ, মাওলানা মওদুদীর মত আলেমে দ্বীন, দ্বীনের প্রচারক, মুজাহিদ, শহীদ ও আল্লাহর ওলীর পদভারে প্রকম্পিত হয়েছে এখানকার মাটি। হাজার হাজার শহীদানের রক্তে সিঞ্চিত ও উর্বর হয়েছে এখানকার পূণ্যভূমি, ধন্য হয়েছে এখানকার আকাশ-বাতাস, মাটি ও মানুষ। একারণেই এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবীদার এই হিন্দুস্থান।

যেখানে দ্বীনের খেদমত যত জোরদার হয় সেখানে শয়তানের বাধা তত প্রবল হয়। যেখানে মুসা সেখানেই ফেরাউন; যেখানে ইবরাহীম সেখানেই নমরূদ। ইতিহাসের এ এক অমোঘ নিয়ম। এর কোন ব্যতিক্রম হয় না। ইসলাম কখনো বাধামুক্ত থাকে না। স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুস্থানে ইসলামের প্রসার হয়েছিল প্রবল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করেই। যারা এখানে যত বেশী ইসলামের খেদমত করেছেন তাদেরকে তত বেশী প্রতিরোধ, নির্যাতন, নিপীড়ন সইতে হয়েছে, এখানো সইতে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও সইতে হবে।

মানব জাতির মধ্যে মুসলমানদের চরম শত্রু হল ইহুদী ও মুশরিকরা। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের সূরা ইমরানের ৮২ নং আয়াতে বলেন, "মানবজাতির মধ্যে ইহুদী ও মুশরিকরাই ঈমানদারদের প্রতি সবচে' বেশি শত্রুতা পোষণ করে"।

বর্তমানে সবচে' বেশি সংখ্যক ইহুদী বাস করে মধ্যপ্রাচ্যের ইসরাঈলে এবং বিপুল সংখ্যক মুশরিক বাস করে হিন্দুস্থানে। হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হিন্দুস্থানে মুসলমানদের প্রতি কুফরী শক্তির চরম বাধা আসবে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রাক্কালে। মুসলমানদের সাথে এ সময়ে মুশরিকদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হবে যাকে রহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাগজুল হিন্দ (হিন্দুস্থানের জিহাদ) নামে অভিহিত করেছেন। ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে এই যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় হবে, কুফরী শক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। একই সময়ে হযরত ঈসা (আঃ) এর নেতৃত্বে আরব মুসলমানগণ ইহুদী-খ্রিস্টান শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবে। এ সময়ে এখানে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং সে ইহুদী-খ্রিস্টানদের নেতৃত্ব দিবে। মুসলমানগণ এদেরকে পরাজিত করে চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে। মুসলমানগণ ইহুদীদেরকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন

করে দিবে যে পৃথিবীতে তাদের আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না। হাদীস শরীফে এসেছে, "এমনকি গাছ, পাথরও মুসলমানদেরকে ডেকে বলবে, এই যে এখানে ইহুদী লুকিয়ে আছে, এদেরকে হত্যা কর।"

ঈসা (আ.), দাজ্জাল ও ইমাম মাহদী সম্পর্কে বিপুল সংখ্যক সহীহ হাদীস রয়েছে। এ সকল হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, হিন্দুস্থান বিজয়ের পর ইমাম মাহদী মধ্যপ্রচ্যের দিকে মার্চ করবেন এবং সেখানে হযরত ঈসা (আ.) এর সাথে মিলিত হবেন। তখন সারা বিশ্ব থেকে কুফরী শক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। গোটা বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে। হযরত ঈসা (আ.) ও ইমাম মাহদীর নেতৃত্ব বেশ কিছু বছর গোটা বিশ্ব পরিচালিত হবে। ঝঞ্ঝা-বিক্ষুদ্ধ পৃথিবীতে পরিপূর্ণ শান্তি ফিরে আসবে। কোথাও কোন অন্যায়, অনাচার অশান্তি, অভাব-অভিযোগ থাকবে না। থাকবে শুধু শান্তি আর শান্তি।

হিন্দুস্থানের জিহাদের সবচে' উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলঃ এই যুদ্ধে যারা অংশ গ্রহণ করবে এবং যারা ঈসা (আঃ) এর সাথে থাকবে তারাই বেহেশতে যাবে। দোযখের আগুন তাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে। তারা যদি শহীদ না হয় তবুও। আর কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের জন্য এ রকম সুসংবাদ দেওয়া হয় নাই। যুগে যুগে ইসলামের জন্য যত জেহাদ হয়েছে সে সব যুদ্ধের কেবল শহীদদের জন্যই দোযখের আগুন হারাম হওয়া বা বেহেশত পাওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে; জেহাদে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর জন্য নয়। হযরত ঈসা (আ.) সাথে জেহাদে অংশগ্রহণ কারীদের ব্যাপারেও একই সুসংবাদ রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অত্যাধিক প্রিয় ও মর্যাদাবান সাহাবী হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) হিন্দুস্থানের জিহাদ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার আকাংখা প্রকাশ করেছেন।

চৌদ্দশ' বছর আগেই যদি রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সাহাবীগণ হিন্দুস্থানের জিহাদে অংশ গ্রহণের আশা পোষণ করে থাকতে পারেন তাহলে আমরা কেন আশা পোষণ করব না-যখন অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় হিন্দুস্থানের জিহাদ অত্যাসন্ন এবং হিন্দুস্থান আমাদের অতি নিকটে। হিন্দুস্থান মূলত আমাদেরই দেশ। পরিস্থিতি যেভাবে গড়াচ্ছে তাতে আমাদের জীবদ্দশায়ই প্রতিশ্রুত হিন্দুস্থানের জিহাদ সংঘটিত হতে পারে।

ভারত পাকিস্তান এ উপমহাদেশের দুটি বৈরি প্রতিবেশী দেশ। এদের একটি মুশরিক অপরটি মুসলিম দেশ। দুটি দেশই সামরিক শক্তিতে অগ্রসর এবং পারমাণবিক শক্তির অধিকারী। সুতরাং হিন্দুস্থানের যুদ্ধ বাধলে তা যে ঘোরতর হবে তাতে সন্দেহ নাই।

অনেক দিন থেকেই ভারতে মাঝে মধ্যে মুসলিম নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চলছে। স্বাধীনতাকামী কাশ্মীরের যুদ্ধরত মুজাহিদদের দমনের জন্য সেখানে চলছে মুসলিম হত্যা, নির্যাতন ও নিপীড়ন।

অনুরূপভাবে অর্ধ শতাব্দীকালেরও বেশি সময় ধরে মধ্যপ্রাচ্যের ফিলিস্তিনে মুসলিম নিধন চলছে। এমন দিন খুব কমই যায় যে দিন ইহুদীদের দ্বারা কোন ফিলিস্তিনী মুসলিম নির্যাতিত বা নিহত হচ্ছে না। ইদানিং আশংকাজনক ভাবে এখানে মুসলিম নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেছে। এক মাসের মধ্যে পর পর দুই জন ফিলিস্তিনী আধ্যাত্মিক নেতাকে ইহুদীরা ঘোষণা দিয়ে হত্যা করেছে। এর পরেও তারা অনুরূপ হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাবে বলে সদম্ভ ঘোষনা দিয়ে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছে। অথচ বিশ্ব সম্প্রদায় আজ নীরব। কেউ প্রতিবাদে এগিয়ে অসছে না। হায় মানবতা! হায় বিশ্ব বিবেক! কোথায় সেই মানবাধিকার আর গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা? বিচারের বাণী আজ নিভৃতে কাঁদে।

আর কত রক্ত দিতে হবে মুসলমানদের! তাদেরকে আর কত অপমান-নির্যাতন সইতে হবে ইহুদি-মুশরিকদের হাতে? অন্যায় ভাবে কোন নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে মুসলমানদের দেশ দখল করা হচ্ছে, মুসলিম নেতাদেরকে হত্যা ও নির্যাতন করা হচ্ছে। দেশে দেশে হাজার হাজার মুসলিম নারী-পুরুষ, শিশুদেরকে পৈশাচিক ভাবে হত্যা ও নির্যাতন করা হচ্ছে; অথচ কারো কোন মাথা ব্যাথা নেই। যেন এতে কোন অপরাধ নেই।

বিশ্বের অর্ধ শতেরও বেশি মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা নীরব। তারা বৃহৎ পরাশক্তির ভয়ে জড়সড়ো। অনেকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে বৃহৎ পরাশক্তির অনুগত হয়ে বরং তাদের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। ওদের খুশি করার জন্য নিজ দেশের মুসলিম মুজাহিদদেরকে সন্ত্রাসী, মৌলবাদী আখ্যায়িত করে ধরে ধরে ওদের হাতে তুলে দিচ্ছে। মুসলমানদের জন্য এর চেয়ে লজ্জার ও অপমানের বিষয় আর কি হতে পারে?

কিন্তু এত ভয় করেও কি কোন লাভ হবে? ওরা সুযোগ পেলেই একে একে সবাইকে ধরবে। কাউকে রেহাই দেবে না। ভয় করলে ভয় আরও চেপে বসে। কথায় আছে ভয় করলে ভয় ভয় না করলে কিছুই নয়। সাহস করে যদি মুসলিম দেশগুলো অপশক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতো তাহলে তারা কিছুই করার সাহস পেত না। সে পজিশন এখনো তাদের হয় নি। কিন্তু মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানগণ সে দূরদর্শিতা দেখাতে পারল না। মুসলিম দেশগুলোকে একজোট করার মত কোন নেতাও মুসলিম বিশ্বে নেই। তারা আজ এই নীতি অবলম্বন করছে যে, সবাই মরে যায় যাক, আমি তো বাঁচি। কিন্তু এভাবে কেউ বাঁচতে পারবে না। বাঁচতে হলে হিম্মত নিয়ে সবাইকে বাঁচতে হবে। নইলে সেই কৃষক ও রাজপুত্রের গল্পের মত অবস্থা হবে।

রাজার পুত্র, মন্ত্রীর পুত্র ও পুরোহিত্রের পুত্র এরা তিন বন্ধু প্রতিবেশী এক কৃষকের আখ ক্ষেতে গিয়ে প্রতিদিন আখ খায়। কৃষক বেচারা এই তিন কিশোরের সাথে কিছুতেই পেরে ওঠে না। অবশেষে সে এক বুদ্ধি আঁটলো। একজন একজন করে ওদেরকে ঘায়েল করতে হবে। আখ ক্ষেতে লুকিয়ে থেকে একদিন সে পুরোহিতের ছেলেকে ধরে ফেলল। রাজার পুত্র ও মন্ত্রীর পুত্রকে সে বলল, দেখ তোমরা হলে রাজার ছেলে ও মন্ত্রীর ছেলে। তোমরাই তো দেশের মালিক। তোমরা যত খুশি আখ খাও। কিন্তু পুরোহিতের ছেলে খাবে কেন? তাকে আঁখ খেতে দেব না। রাজার ছেলে ও মন্ত্রীর ছেলে ভাবল, আমরা শুধু শুধু পুরোহিতের ছেলের জন্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হব কেন, ওকে যা করে করুক। আমরা তো বাঁচি। অতপর কৃষক পুরোহিতের ছেলেকে আখ দিয়ে পিটিয়ে ধরাশারী করে ফেলল। আর এরা দু'জন চেয়ে চেয়ে দেখল। পুরোহিতের ছেলেকে আধমরা করে ফেলে রেখে কৃষক এবার রাজার ছেলেকে অনুরূপভাবে বুঝিয়ে মন্ত্রীর ছেলেকে ধরাশারী করল। পুরোহিতের ছেলে ও মন্ত্রীর ছেলেকে ধরাশায়ী করার পর এবার রাজার ছেলের পালা। তাকে শাস্তি দিতে কৃষকের এখন আর কোন বাধা রইল না। এ ভাবে সে একে একে তিনজনকেই ধরাশায়ী করল যা একসাথে করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

মুসলিম বিশ্বের এখন ঠিক এই অবস্থা হয়েছে। অ্যামেরিকা একটি একটি করে মুসলিম দেশ দখল করে নিচ্ছে আর অন্য দেশগুলো বোকার মত ওদের কথায় আশ্বস্থ হয়ে বসে বসে দেখছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে মুসলিম দেশগুলোর একে একে সবারই ভয়াবহ পরিণতি হবে। যাহোক, বলছিলাম বিশ্বব্যাপি মুসলিম নিধনের কথা। হাজার হাজার মুসলিম নারী পুরুষ অমুসলিমদের হাতে নিহত ও নির্যাতিত হচ্ছে তাতে যেন কোন অপরাধ নেই। অপরাধ সব মুসলমানদের। অথচ কোথাও কোন ইহুদি বা খ্রিস্টান নিহত হলে বা আটকা পড়লে বিশ্বে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়।

বেশ কয়েক বছর আগে এলিয়েদা নামে এক মার্কিন তরুণী মাদকদ্রব্য পাচারের অপরাধে জিয়া আন্তজার্তিক বিমানবন্দরে ধরা পড়ে। বিচারে তার কয়েক বছরের জেল হয়। ফলে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কিছুদিন অন্তরীণ থাকে। সামান্য এই মাদক পাচারকারী অপরাধী মার্কিন তরুণীর জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত খবর পৌঁছে যায়। মার্কিন প্রশাসনের উচ্চ মহলে তোলপাড় শুরু হয়। অবশেষে একজন মার্কিন সিনেটর নিজে এসে দেনদরবার করে এলিয়েদাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

আজ একজন মুসলিম নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধানের মুল্য এই এলিয়েদার মত সামান্য একজন অপরাধী মার্কিন তরুণীর চেয়েও কম। অথচ ইতিহাস সাক্ষী, বেশিদিন অগের কথা নয় যখন গোটা বিশ্বের একচ্ছত্র শাসন কর্তৃত্ব ছিল মুসলমানদের হতে। সপ্তম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানগণ বিশ্ব শাসন করেছে। সে সময়ে কেউ অন্যায়ভাবে নির্যাতিত হয়নি। এ ইতিহাস থেকে অমুসলিমদের শিক্ষা নেওয়া উচিত।

কিন্তু তারা শিক্ষা নেয় না; বরং মুসলমানদের স্বর্ণযুগ মধ্যযুগে তারা বর্বরতার গন্ধ খুঁজতে চেষ্টা করে। অঘটন কিছু ঘটলে বলে 'মধ্যযুগীয়বর্বরতা, মধ্যযুগীয় কায়দা। মুসলমানদের স্বর্ণযুগ ছিল বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরম উৎকর্ষের যুগ।

বিশ্ব সভ্যতা সংস্কৃতি নির্মাণে যাদের সবচে' বেশি অবদান সেই মুসলমানরাই আজ অসভ্য বর্বরদের চরম বর্বরতার শিকার।

এ অবস্থা বেশিদিন চলতে পারে না। এ অবস্থার অবশ্যই অবসান হবে। মুসলমানরা আবার তাদের হারানো গৌরব ফিরে পাবে। আবার তারা বিশ্বে বিজয়ীর আসনে অধিষ্ঠিত হবে বলে হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। তবে তা সহজসাধ্য হবে না। এর জন্য আরও অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। বিশ্ব মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। বিশেষ করে ইসলাম প্রভাবিত বিশ্বের দুটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিন্দুস্থান ও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের সেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে যার ভবিষ্যদ্বাণী স্বয়ং আল্লাহর নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ব্যক্ত করেছেন।

আমরা আমাদের জীবদ্দশায় হিন্দুস্থানের জিহাদ যদি না পাই তাহলে আমাদের উত্তরাধিকারীদেরকে অসীয়ত করে যেতে হবে হিন্দুস্থানের জেহাদে অংশ গ্রহণ করার জন্য। তাদেরকে সেইভাবে গঠন করে যেতে হবে, উদ্বুদ্ধ করতে হবে যেভাবে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাহাবীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। কারণ এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের মর্যাদা প্রথম যুগের অর্থাৎ রাসুল (সা.) এর যুগের মুজাহিদদের মত। আর এ যুদ্ধে অংশ নিলেই সে বেহেশত পাবে। বেহেশত লাভের এর চেয়ে সহজ উপায় আর নাই। অন্তত আমার জানা নাই।

মানুষের জীবনের অনেক চাওয়া পাওয়া থাকে কিন্তু সবচে বড় পাওয়া (Chief achement) হল বেহেশত পাওয়া। সুতরাং সবচে বড় অর্জন লাভের চেষ্টাই হবে প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ। আল্লাহ আমাদেরকে যেন সেই চেষ্টা করার তৌফিক দিন।

# একটি নিবেদন

মানব জীবনের সর্বপ্রথম ও সর্ব প্রধান মৌলিক প্রশ্ন সম্ভবত এই যে, আমি কে? আমার কর্তব্য কী? কোথা থেকে এসেছি, কোথায় আমার গন্তব্য? কিসে আমার মুক্তি ও কল্যাণ?

যুগে যুগে বহু মনীষী ও দার্শনিক এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ওহীর জ্ঞান ছাড়া এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। আসুন আমরা ওহীর জ্ঞান থেকে উত্তর জানতে চেষ্টা করি।

এ কথা আমরা সবাই বিশ্বাস করি যে, আমরা আল্লাহর নিকট থেকে এসেছি এবং আল্লাহর কাছেই ফিরে যাব। আরবীতে একথাটি হল "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন"-যা পবিত্র কোরআন শরীফে রয়েছে। বাক্যটি আমরা সবাই জানি। কিন্তু আমরা কি তা গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধি করি? নিশ্চয় না। এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আমরা বেমালুম ভুলে থাকি। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনের সুরা আসরে বলেছেন,

**"সময়ের শপথ! নিশ্চই মানুষ ভুলের (ক্ষতির) মধ্যে রয়েছে। শুধু তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে, হক পথের উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্য ধারণ করেছে।"**

বেশির ভাগ মানুষই ভুলের মধ্যে বা ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। বিশেষ করে এ যুগের মানুষ। কারণ উক্ত আয়াতগুলোর আলোকে আমরা যথাযথভাবে ঈমান ও নেক আমলের চর্চা করি না। আখেরাতের জীবনের চিন্তা করি না। এ বিষয়ে আমাদের উপলব্ধি তীব্র নয়।

হাদীস শরীফে আছে, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাহাবীদের যুগ ও তাঁদের নিকটবর্তী যুগ ছিল সর্বোত্তম যুগ।" তাঁরা বিষয়টি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতেন বিধায় তাঁদের জীবনাচরণ অন্যরকম ছিল। তাঁরা দুনিয়ার জীবনের উপর আখেরাতের জীবনকে প্রাধান্য দিতেন। আখেরাতের জীবনের সফলতা পাবার জন্য তাঁরা যতখানি পাগলপারা ছিলেন ঠিক ততখানি পাগলপারা আমরা এখন দুনিয়ার জীবনের জন্য। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, "তবে কি তোমরা অস্থায়ী দুনিয়ার জীবনকেই প্রাধান্য দিতে চাও? অথচ আখেরাত হল উত্তম এবং চিরস্থায়ী।" (সূরা আ'লা)।

"তোমরা কি আখেরাতের জীবন ছেড়ে দুনিয়ার জীবন নিয়েই পরিতুষ্ট? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের সামগ্রী অতি নগণ্য।" (সূরা তওবাঃ ৩৮)

দুনিয়ার মূল্য যদি এক টাকা ধরা হয়। তাহলে আখিরাতের মূল্য এক কোটি টাকারও বেশি। তবু মানুষ কোটি টাকার চেয়ে এক টাকাকেই প্রাধান্য দেয় অর্থাৎ আখিরাতের চেয়ে দুনিয়াকেই প্রাধান্য দেয়। বর্ণিত আছে যে, মানুষকে নির্বোধ করে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ নির্বোধ না হলে দুনিয়া অচল হয়ে যেত। দুনিয়া ও আখিরাতের পার্থক্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারলে মানুষ দুনিয়াকে বাদ দিয়ে আখিরাতের ভাবনায় বিভোর থাকত।

আমরা একথা বিশ্বাস করি; কিন্তু গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করি না। কারণ শয়তান আমাদেরকে দুনিয়ার মোহে ভুলিয়ে রাখে। শয়তান না থাকলে বা প্ররোচনা না দিলে মানুষ কোন অন্যায় কাজ করতো না। শয়তান সব সময়, সব অবস্থায় মানুষকে ধোঁকা দিতে থাকে।

যদি আমরা আখেরাতের সুখ অথবা শাস্তির কথা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারতাম তাহলে আমাদের জীবনাচরণও অন্যরকম হতো। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যথার্থই বলেছেন, **"আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে হাসতে কম কাঁদতে বেশি। বিছানায় শুয়ে আনন্দ করতে পারতে না। পাগলের মত বনে প্রান্তরে ছুটে বেড়াতে আল্লাহর আশ্রয়ের সন্ধানে।"**

## শ্রেষ্ঠ মানুষদের জীবনাচরণ

যারা প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাঁদের জীবনাচরণ কেমন ছিল? আমরা হযরত আসিয়ার কথা জানি। সারা পৃথিবীর সর্বময় ক্ষমতাধর বাদশাহ ফেরাউনের স্ত্রী ছিলেন তিনি। অথচ তিনি দুনিয়ার সুখ-ঐশ্বর্য, বিলাস-ব্যসনকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলেন আখেরাতের চিরস্থায়ী সুখের আশায়। ফেরাউনের নির্মম নির্যাতনে প্রাণ দিলেন তবু আল্লাহর দ্বীন থেকে একটুও বিচ্যুত হননি। আল্লাহর এত প্রিয় ছিলেন তিনি এবং এত নৈকট্য লাভ করেছিলেন যে, আল্লাহর কাছে কিছু আবদার করলে আল্লাহ তা মঞ্জুর করতেন। ফেরাউনের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তিনি যে দুয়া করেছিলেন আল্লাহ তাআলা তা পবিত্র কুরআনে হুবহু উদ্ধৃত করেছেন-যা আমরা পাঠ করে থাকি। তিনি দুয়া করেছিলেন,

"হে আমার প্রতিপালক, আমাকে এই জালেম ফেরাউন এর হাত থেকে রক্ষা কর এবং জান্নাতে আমার জন্য একটি প্রাসাদ তৈরি করে দিও।" (সূরা ঃ তাহরীম আয়াতঃ ৮)

ফেরাউনের দাসীও ছিল অনুরূপ ঈমানদার। ঈমান ত্যাগ করানোর জন্য ফেরাউন তাকে ও তার শিশু সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করে হত্যা করে। তবু তারা ঈমান ত্যাগ করেনি। মায়ের সামনে যখন এই দুগ্ধপোষ্য শিশুকে আগুনে নিক্ষেপ করা

হয় তখন আগুনে পড়ার পূর্ব মূহুর্তে শিশুটি তার মাকে বিজ্ঞ মানুষের মতো উপদেশ দেয়, "মা, ধৈর্য ধারণ কর; ঈমান হারাবে না।"

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেছেন, "মানুষকে নির্বোধ করে তৈরি করা হয়েছে। তা না হলে মানুষ দুনিয়ায় আনন্দ উপভোগ করতে পারতো না।" কেননা যার মধ্যে এই বোধ তীব্র যে, দুনিয়ার জীবন নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী, কত দিন সে দুনিয়ায় থাকতে পারবে, জানে না আর আখেরাতের জীবনই চিরস্থায়ী, সেখানকার সাফল্যই প্রকৃত সাফল্য-সে কিভাবে দুনিয়ায় আনন্দ করতে পারে।

আমরা হযরত উমার (রাঃ) এর কথা জানি। দুনিয়া ও আখেরাত সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধি কেমন ছিল? অর্ধেক পৃথিবীর শাসক এবং তদানিন্তন পৃথিবীর সবচাইতে ক্ষমতাধর শাসনকর্তা হয়েও তাঁর গায়ে শোভা পেত বারটি তালিযুক্ত জামা। একবার রোমের রাষ্ট্রদূত এসে হযরত উমার (রাঃ) এর সাথে দেখা করতে চাইলে তাকে বলা হল তিনি (উমর) এখন মাঠের মধ্যে গাছের নিচে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। রাষ্ট্রদূত সেখানে গিয়ে দেখেন সত্যি তাই, পৃথিবীর সবচাইতে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রপ্রধান গাছের নিচে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন।

আল্লাহর ভয়ে হযরত উমর (রাঃ) সদা কম্পমান থাকতেন। তিনি এতবেশি কাঁদতেন যে, নামাজের মধ্যে কান্নার কারণে অনেক সময় কেরাত পড়া আটকে যেত। আল্লাহর ভয়ে মাঝে মাঝে বেহুঁশ হয়ে পড়তেন এবং কখনো কখনো দীর্ঘদিন অসুস্থ হয়ে থাকতেন; কিন্তু তখন তাঁর কোন অসুখ থাকতো না। অথচ হযরত উমার (রাঃ) ছিলেন পৃথিবী থেকেই বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের একজন।

হযরত খাদিজা (রাঃ) ছিলেন মক্কার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ধানাঢ্য রমণী। ইসলামের প্রচার প্রসারের জন্য তিনি নিজেকে এবং নিজের সমস্ত সম্পদকে উৎসর্গ করে দেন। নবী করীম (সাঃ) ইসলামের কাজে যতক্ষণ বাইরে থাকতেন ততক্ষণ তিনি ঘুমাতেন না। নবী (সাঃ) বাসায় ফিরে যখনই দরজায় টোকা দিতেন তখনই খাদিজা (রা) দরজা খুলে দিতেন। এতটুকুও দেরী করতেন না যেন ক্লান্ত শ্রান্ত নবীজীকে (সাঃ) দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে না হয়।

হযরত জায়েদ (রাঃ), হযরত জাফর (রাঃ) ও হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) ছিলেন রোমান সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘটিত মুতার যুদ্ধের তিন সেনাপতি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পবিত্র মুখ থেকে শহীদ হবার আভাস পেয়েও তাঁরা যুদ্ধে যেতে একটুও কুণ্ঠিত হননি। তৎকালীন বিশ্বের সুপার পাওয়ার রোমান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে এই তিনজন বীর সাহাবী শহীদ হয়ে যান। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) এর বাসর ঘরের নববিবাহিতা বধূ কিংবা হযরত জাফর (রাঃ) এর ছোট ছোট সন্তানেরা তাঁদেরকে পিছু টানতে পারেনি। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে এই তিন জন শহীদের জন্য বেহেশতের

মধ্যে পাশাপাশি তিনটি সোনার খাট রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার খাটটি একটু বাঁকা । কারণ প্রথম দুই সেনাপতি শহীদ হবার পর তিনি শহীদ হতে বা যুদ্ধে নামতে একটু বিলম্ব করেছিলেন।

হযরত আনাস বিন নাদর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, বদর যুদ্ধে অংশ নিতে পারেন নি বলে আক্ষেপ করতেন। তিনি বলতেন, যদি আল্লাহ আমাকে এর পরে কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেন তাহলে তিনি দেখে নেবেন আমি তাঁর জন্য কি করি।

পরবর্তীতে উহুদ যুদ্ধে আল্লাহ তাঁকে সে সুযোগ দিলেন। উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক বিপর্যয় ঘটার পর এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর শাহাদাতের গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর সাহাবীরা সবাই নিথর হয়ে বসে ছিলেন। এমন সময় আনাস (রাঃ) বললেন, তোমরা সবাই বসে আছ কেন? জবাব এল, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিহত হয়েছেন। আনাস (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহই (সাঃ) যদি বেঁচে না থাকেন তাহলে আমাদের বেঁচে থেকে কি লাভ? ওঠ, জেহাদ কর। এই বলে তিনি তরবারি চালাতে চালাতে সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন। পেছন থেকে সবাই তাঁকে একাকী অগ্রসর হতে নিষেধ করতে থাকলে আনাস (রাঃ) বললেন, আমাকে তোমরা আর পিছু ডেকো না, আমি উহুদ পাহাড়ের অপর প্রান্ত থেকে বেহেশতের সুগন্ধ পাচ্ছি।

অতপর যুদ্ধ করতে করতে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল তার শরীরে আশিটিরও বেশি তীর, বর্শা ও তরবারীর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

এভাবে সাহাবীগণ ও আল্লাহওয়ালা লোকদের জীবনী পাঠ করলে জানতে পারা যায় তাঁরা পরকালীন মুক্তি ও কল্যাণের জন্য কতখানি পেরেশান ও পাগলপারা ছিলেন। তাঁরা দুনিয়া ও আখিরাতের সঠিক রূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই তাঁদের কর্মকাণ্ড ও জীবনাচরণ এমন ছিল। বলা হয়ে থাকে এযুগের মানুষ তাঁদেরকে দেখলে পাগল মনে করত আর তাঁরা এযুগের মানুষকে দেখলে কাফের মনে করতো। আসলে তাঁরাই সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁরাই ছিলেন সত্যপন্থী।

মানব জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্ন হলঃ মানুষের কাজ কি? দায়িত্ব ও কর্তব্য কি?

আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি জীন ও মানবকে শুধু আমার ইবাদত করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি। (সূরা যারিয়াহ্ ঃ ৫৬) আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, "বল আমার নামাজ, আমার কুরবানী (ত্যাগ), আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সবকিছুই আল্লাহর জন্য।" (সূরা আনআম ঃ ১৬২)

**সুতরাং মানুষ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহর ইবাদত করে তাঁর সন্তোষ অর্জন করা।**

**মানব জীবনের তিনটি পর্যায়**

দুনিয়ার জীবন মানুষের একমাত্র জীবন নয়। মানব জীবনের তিনটি পর্যায়;

১. আত্মার জগতের জীবন

২. দুনিয়ার জীবন

৩. আখিরাতের জীবন

এই তিন পর্যায়ের মধ্যে আখিরাতের জীবন হল চিরস্থায়ী ও আসল জীবন। অন্য দুটি জীবন অস্থায়ী এবং দুনিয়ার জীবন সবচে' ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং আখিরাতের জীবন খুব দূরে নয়। খুব শীঘ্রই আমাদের সবাইকে আখেরাতের জীবনে পৌঁছাতে হবে। 'কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত" প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আমরা কতদিন দুনিয়ায় বেঁচে থাকবো কেউ জানিনা। বড়জোর পঞ্চাশ-ষাট বছর বা তারও কম। এর মধ্যেই আমাদেরকে এই নশ্বর পৃথিবীর সবকিছু ছেড়ে আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনে প্রবেশ করতে হবে। কেউ বাদ যাবে না। এ সংক্ষিপ্ত জীবন নিয়ে আমাদের এত বড়াই, এত অস্থিরতা, এত ভাবনাহীন ছুটে চলা। অথচ চিরস্থায়ী পরকালের জীবনের জন্য এর শতভাগের একভাগও চেষ্টা করি না।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত উমর (রা) কে যে কথাগুলো বলেছিলেন তা আমার, আপনার সবার জন্যই সমান সত্য। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন, হে উমার (রা) তোমার যখন মৃত্যু হবে তখন তোমার কি অবস্থা হবে? লোকজন তোমাকে নিয়ে যাবে, তোমার জন্য তিন হাত দীর্ঘ এবং দেড় হাত প্রস্থ একটি গর্ত তৈয়ার করা হবে। তারপর তারা তোমাকে গোসল করাবে, কাফন পরাবে। তারপর তোমাকে খাটে বহন করে নিয়ে যাবে, যে পর্যন্ত না তারা তোমাকে কবরে স্থাপন করে। কবরে স্থাপন করার পর তোমার উপরে তারা মাটি বিছিয়ে দেবে এবং তোমাকে দাফন করা হবে। দাফন করার পর তারা তোমার নিকট থেকে যার যার গৃহে চলে যাবে। তখন কবরের বিপদ স্বরূপ মুনকার ও নাকীর আগমন করবে। তাদের কণ্ঠের আওয়াজ বজ্র ধ্বনির ন্যায়। চক্ষুদ্বয় বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল, তদের মস্তকে ঘন কেশরাজি দু'পদ পর্যন্ত দীর্ঘ, তাদের দীর্ঘ তীক্ষ্ণ দন্তরাজি কবরের মৃত্তিকা বিদীর্ণ করে ফেলবে। কবরের মধ্যে অবতরণ করেই তারা তোমাকে হেলাতে-দোলাতে থাকবে। হে ওমর! বলত, তোমার সে সময় কি অবস্থা হবে? হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)! আল্লাহ প্রদত্ত আমার বুদ্ধি কি আমার সাথে থাকবে? হুযুর পাক (সাঃ) বললেন, তা' অবশ্যই থাকবে। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, তবে তা-ই আমার পক্ষে যথেষ্ট। (ইহইয়াও উলুমিদ্দীন)

এ অবস্থা যে আমারও হবে, আপনারও হবে, কিন্তু আমরা তা কমই স্মরণ করি। আমাদের উচিত মাঝে মাঝে নিরবে নিভৃতে এ বিষয়গুলো স্মরণ করা যেমনভাবে পূর্ব যুগের উত্তম মানুষেরা স্মরণ করতেন এবং ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন।

আমাদের আত্মীয় স্বজনদের অনেকেই ইতোমধ্যে আখিরাতের জীবনে পাড়ি জমিয়েছেন। তারা এক সময় আমাদের মাঝেই বসবাস করতেন। এখন তাঁদের কি অবস্থা কেউ জানে না। আমাদেরকেও তাদের সাথে মিলিত হতে হবে। দুনিয়ার সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ছেড়ে একাকী কবরে থাকতে হবে। এ নির্মম সত্য বিষয়টি আমরা ভুলে থাকি। হযরত আলী (রা) এ ব্যাপারে চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, **"আমরা প্রায়ই আমাদের মত অন্য মানুষকে মারা যেতে দেখি কিন্তু নিজের মৃত্যুর কথা ভুলে থাকি।"**

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "দুনিয়ার স্বাদ-গন্ধ, রূপ-রস হরণকারী মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ কর।" মৃত্যু যে কত অনিশ্চিত তা কেউ আমরা ভেবে দেখি না। কেউ একদিন কিংবা এক মুহূর্তকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। ঈমাম গাজ্জালী (র) বলেছেন, কত লোকের এমন হয় যে, শ্বাস নিয়ে তা ফেলবার সুযোগও পায়না। এর মধ্যেই তার মৃত্যু এসে যায়। রাসুলুল্লাহও (সা) মুহূর্তকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন বলে নিশ্চিন্ত থাকতেন না।

## মৃত্যু নিশ্চিত কিন্তু জীবন অনিশ্চত

মৃত্যু অবধারিত সত্য। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক এ সত্যের কাছে সকলকে আত্ম সমর্পণ করতে হয়। অথচ এ যুগে খুব কম মানুষই আছে যারা মৃত্যুর আগেই মৃত্যুর প্রস্তুতি নিতে পারে।

আমার চেনা জানা অনেকের হঠাৎ করে এমন অপমৃত্যু হয়েছে যা কেউ চিন্ত াও করেনি। এদের একজন সকাল সাতটার দিকে বাসা থেকে বেরিয়ে বিদ্যুতের ছেঁড়া তারে স্পৃষ্ট হয়ে ঘটনা স্থলেই মারা গেছে। রাত্রি বেলায় ঝড়ে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়ে ছিল।

আরেকজন ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। মিরপুর এক নম্বরে বাসা। বাসায় বৈদ্যুতিক হিটার ঠিক করতে গিয়ে শক লেগে মারা গেছে। সে ছিল অত্যন্ত সুঠাম দেহের অধিকারী একজন ক্রিড়াবিদ।

আমার গ্রাম পাবনা জেলার গাবগাছিতে আমাদের প্রতিবেশী এক মহিলা হঠাৎ করে বজ্রপাতের আঘাতে মারা গেছে। কিছুদিন আগে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ জন ছাত্রের সলিল সমাধির ঘটনা সবাইকে শোকে মুহ্যমান করেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অক্টোবর স্মৃতি হল স্মরণ করিয়ে দেয় সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা যেদিন জগন্নাথ

হলের পুরাতন একটি ভবনের ছাদ ধ্বসে ৩৯ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের করুণ মৃত্যু ঘটে। সেদিন হতভাগ্য ঐ ছাত্রদের আত্মীয় স্বজনের করুণ আর্তনাদ আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম। প্রত্যক্ষ করেছিলাম তাদের লাশের স্তূপ আর রক্তের স্রোত।

এ রকম দুর্ঘটনার সাক্ষী আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে। যে কোন সময় যে কারো ভাগ্যেই এমন দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। আমাদের মধ্যে কার কখন, কোথায়, কিভাবে মৃত্যু হবে তা সুস্পষ্ট কিতাবে নির্দিষ্ট করে লেখা আছে। আমরা কেউ তা জানি না। যদি জানতাম তাহলে আমাদের চালচলন কেমন হতো?

অনেক সময় ক্যান্সার বা এরকম দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে ডাক্তার বলে দিতে পারে যে রোগী আর কত দিন বাঁচতে পারে। দুই মাস, এক মাস বা এক সপ্তাহ। যদি আমার বা আপনার ক্ষেত্রে এমন হয় যে, আমাদের আর এক মাস আয়ু আছে বলে জানা গেছে, তখন আমাদের এই এক মাসের কর্মসূচি কেমন হবে? নিশ্চয়ই বর্তমানে স্বাভাবিকভাবে যেমন চলছি তেমন নয়। তখন আমাদের দুনিয়ার মোহ উঠে যাবে। আল্লাহ ও পরকালের চিন্তায়ই হবে প্রধান কর্মসূচি। অনেকের ক্ষেত্রে এরূপ হতে দেখেছি।

যদি মৃত্যুর খবর আগাম জানার কারণে আমাদের জীবনের কর্মসূচির আমূল পরিবর্তন ঘটে যায় তাহলে আগাম না জানলেও জীবনের কর্মসূচি অনুরূপ হওয়া দরকার। কারণ মৃত্যু যে আমাদের ঘটবেই এ ব্যাপারে আমরা সবাই নিশ্চিত; কিন্তু কবে ঘটবে সে ব্যাপারে কেউ নিশ্চিত নই। মৃত্যু নিশ্চিত বরং জীবন অনিশ্চিত।

হযরত ইমাম গাজ্জালী (রা) রচিত 'ইহইয়াউল উলুমিদ্দীন' কিতাবে বর্ণিত আছে যে, জনৈক বাদশাহ একদিন তার প্রাসাদে নারী, মদ, গান বাজনা নিয়ে আনন্দ ফুর্তিতে মেতে ছিল। এমন সময় মৃত্যুদূত হযরত আজরাইল (আ) আল্লাহর আদেশে বাদশাহর প্রাণ হরণ করার জন্য মানুষের বেশে এসে প্রাসাদের দরজায় নক করলেন। অসময়ে বিরক্ত করার জন্য বাদশাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল। বাদশাহর আদেশে তার অনুচরেরা হযরত আজরাইল (আ) কে তাড়িয়ে দিতে গেলে তিনি বললেন, আমাকে বাদশাহর কাছে যেতে দাও। আমি এমন এক ব্যক্তি যে, কেউ আমাকে বাধা দিতে পারে না। আমি মৃত্যুদূত আজরাইল। একথা শুনে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত বাদ্য-গান, আনন্দ ফুর্তি স্তব্ধ হয়ে গেল। মহা আতঙ্কে সবকিছু নীরব নিথর হয়ে গেল। বাদশার সকল কর্মকাণ্ড, সকল কর্মসূচি মুহূর্তের মধ্যে পাল্টে গেল। মৃত্যুদূত বাদশাহকে তার মৃত্যুর সময় হয়ে গেছে বলে জানালেন। বাদশা মৃত্যুদূতকে অন্তত আর একটি দিন সময় দেবার জন্য অত্যন্ত কাতর স্বরে অনুরোধ করল যাতে সে তার কৃতকর্মের জন্য তওবা-অনুশোচনা করে নিতে পারে। মৃত্যুদূত বললেন, মৃত্যুর সময়-ক্ষণ নির্দিষ্ট, এক মুহূর্ত সময় বাড়ানো সম্ভব নয়। তবু বাদশাহ বারবার অনুরোধ করতে লাগল আর একটু

সময় দেবার জন্য। তাকে সময় দেয়া হল না। তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হল। তওবা বা অনুশোচনার কোন সুযোগ সে পেল না।

## মৃত্যুর প্রস্তুতি নেবার আগেই মৃত্যু এসে যায়

অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই এমনটি হয়ে থাকে। তারা মনে করে আরেকটু অবসর হয়ে নেই, আরেকটু গুছিয়ে নেই তারপর আল্লাহর কাজ করব, তওবা করে পরকালের প্রস্তুতি নেব। এইভাবে তার মৃত্যুর সময় এসে যায় তবু তার প্রস্তুতি নেবার সময় আসে না। অধিকাংশ মানুষ তার মৃত্যু না আসা পর্যন্ত মৃত্যুর প্রস্তুতি নিতে পারে না। আপনি বা আমিই কি পেরেছি? এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখা দরকার। আমরা ছোট বড় সব কাজের জন্য প্রস্তুতি নেই পরীক্ষায় পাসের জন্য, সফরে যাওয়ার জন্য কিংবা চাকুরির ইন্টারভিউ এর জন্য কত প্রস্তুতি গ্রহণ করি। অথচ সবচে' সত্য, সবচে' করুণ, সবচে' গুরুত্বপূর্ণ, জীবনের সর্বশেষ ঘটনা মৃত্যুর জন্য আমাদের কোন প্রস্তুতি নাই, কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। এ কি চরম নির্বুদ্ধিতার কাজ নয়?

আল্লাহর প্রিয় মুমিন বান্দারা মৃত্যুর জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকে। তারা দুনিয়ায় বেঁচে থাকার চেয়ে আখেরাতকেই বেশি প্রাধান্য দেয়। কারণ তারা জানে যে মৃত্যুর পরেই তাদের জন্য রয়েছে অনন্ত অফুরন্ত সুখের জীবন। দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে আখেরাতের চিরস্থায়ী সুখের জীবনে যাবার জন্য তারা সর্বদা উদগ্রীব থাকে।

হাদীসে আছে আল্লাহর প্রিয় কোন নেক বান্দার মৃত্যুর সময় ফেরেশতাগণ অত্যন্ত সৌম্য স্নিগ্ধ চেহারায় তার কাছে আগমন করে। তাদের সাথে জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধি থাকে। তারা মরণোন্মুখ ব্যক্তির সামনে বসে যায়। অতঃপর মৃত্যুদূত আযরাঈল আসেন এবং তার আত্মাকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে নিশ্চিন্ত আত্মা, পালনকর্তার মাগফেরাত ও সন্তুষ্টির জন্য বের হয়ে আস। তখন তার আত্মা এমন অনায়াসে বের হয়ে আসে, যেমন মশকের মুখ খুলে দিলে তার পানি বের হয়ে আসে। মৃত্যুদূত তার আত্মাকে হাতে নিয়ে উপস্থিত ফেরেশতাদের কাছে সমর্পণ করেন। ফেরেশতারা তা নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে একদল ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা জিজ্ঞেস করে, এ পাক আত্মা কার? ফেরেশতারা তার ঐ নাম ও উপাধি উল্লেখ করে, যা দুনিয়াতে তার সম্মানার্থে ব্যবহার হত এবং বলেঃ ইনি হচ্ছেন অমুকের পুত্র অমুক। ফেরেশতারা তার আত্মাকে নিয়ে প্রথম আকাশে পৌঁছে দরজা খুলতে বলে। দরজা খোলা হয়। এখান থেকে আরও ফেরেশতা তাদের সঙ্গী হয়। এভাবে তারা সপ্তম আকাশে পৌঁছে। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ আমার এ বান্দার আমলনামা

ইল্লীয়্যীনে লিখ এবং তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দাও। এ আত্মা আবার কবরে ফিরে আসে। কবরে হিসাব গ্রহণকারী ফেরেশতা এসে তাকে উপবেশন করায় এবং প্রশ্ন করে তোমার পালনকর্তা কে? তোমার ধর্ম কি? সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ তাআলা এবং ধর্ম ইসলাম। এর পর প্রশ্ন করে, এই ব্যক্তি, যিনি তোমাদের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে? সে বলে ঃ ইনি আল্লাহর রসূল। তখন একটি গায়েবী আওয়াজ হয় যে, আমার বান্দা সত্যবাদী। তার জন্যে জান্নাতের শয্যা পেতে দাও, জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং জান্নাতের দিকে তার দরজা খুলে দাও। এ দরজা দিয়ে জান্নাতের সুগন্ধি ও বাতাস আসতে থাকে। তার সৎকর্ম একটি সুশ্রী আকৃতি ধারণ করে তাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য তার কাছে চলে আসে।

এর বিপরীতে কাফরের মৃত্যু সময় উপস্থিত হলে আকাশ থেকে কাল রঙের ভয়ঙ্কর মূর্তি ফেরেশতা নিকৃষ্ট চট নিয়ে আগমন করে এবং তার বিপরীত দিকে বসে যায়। অতঃপর মৃত্যুদূত তার আত্মা এমনভাবে বের করে, যেমন কোন কাঁটা-বিশিষ্ট শাখা ভিজা পশমে জড়িয়ে থাকলে তাকে সেখান থেকে টেনে বের করা হয়। আত্মা বের হলে তার দুর্গন্ধ মৃত জন্তুর দুর্গন্ধের চাইতেও প্রকট হয়। ফেরেশতারা তাকে নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে একদল ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা জিজ্ঞেস করেঃ এ দুরাত্মাটি কার? ফেরেশতারা তখন ঐ হীনতম নাম ও উপাধি উল্লেখ করে, যদ্দারা সে দুনিয়াতে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ, সে অমুকের পুত্র অমুক। অতঃপর প্রথম আকাশে পৌঁছে দরজা খুলতে বললে তার জন্যে দরজা খোলা হয় না বরং নির্দেশ আসে যে, এ বান্দার আমলনামা সিজ্জীনে রেখে দাও। সেখানে অবাধ্য বান্দাদের আমলনামা রাখা হয়। তখন এ আত্মাকে নীচে নিক্ষেপ করা হয় এবং তা পুনরায় দেহে প্রবেশ করে। ফেরেশতারা তাকে কবরে বসিয়ে মুমিন বান্দার অনুরূপ প্রশ্ন করে। সে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে কেবল হায়, হায়! আমি জানি না বলে। তাকে জাহান্নামের শয্যা ও জাহান্নামের পোশাক দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দিকে দরজা খুলে দেয়া হয়। ফলে তার কবরে জাহান্নামের উত্তাপ পৌঁছতে থাকে এবং কবরকে তার জন্যে সংকীর্ণ করে দেয়া হয়।

অন্য হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, বদকার মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় তখন সে ভয়ে আতংকে চিৎকার করতে থাকে আর আত্মীয় পরিজনের উদ্দেশ্যে বলতে থাকে আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে চলেছ। কোথায় আমাকে একাকী ফেলে রেখে আসবে। তার এই আর্তচিৎকার মানুষ ছাড়া আর সকল প্রাণী শুনতে পায়। কোন মানুষ যদি এই আর্তনাদ শুনতে পেত তাহলে সে তা সহ্য করতে না পেরে বেহুঁশ হয়ে পড়তো।

## কবর থেকে হাসরের মাঠে বিচার পর্যন্ত

কবরের জীবন চলতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। অপরাধীরা কবরে থেকেই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে এবং পুণ্যবানেরা জান্নাতের সুখ-শান্তি উপভোগ করতে থাকবে। এরপর কিয়ামত সংঘটিত হলে সবাই কবর থেকে উঠে হাশরের মাঠে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। "তারা বলবে হায় আমাদের দুর্ভোগ। কে আমাদেরকে ঘুম থেকে উঠালো ? দয়াময় আল্লাহ তো এরই ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্য বলেছিলেন" (সুরা ইয়াসীন, আয়াত:৫২)।

সেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একজন একজন করে সবার বিচার ফয়সালা করবেন। এ সময়ে হাশরের মাঠে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের পরিস্থিতি হবে। ভয়ে টেনশানে যুবকরা বৃদ্ধে পরিণত হবে। চরম অসহায়ত্বে মানুষগুলো হাহাকার করতে থাকবে, উপরের ঠোঁট উপরে উঠে থাকবে এবং নীচের ঠোঁট নীচে ঝুলে পড়বে, দাত ও জিহ্বা বেরিয়ে পড়ে এক বিভৎস দৃশ্যের অবতারণা হবে। সূর্য মাথার উপরে অতি নিকটে অবস্থান করবে। সূর্যের তাপে অনেকের মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে। মানুষের গায়ের ঘামে স্রোত প্রবাহিত হতে থাকবে। ঘামের মধ্যে অনেকের কান পর্যন্ত, গলা পর্যন্ত ডুবে যাবে। "এদিনটি হবে বড়ই কঠিন" (আল কুরআন)।

এই কঠিনতম বিপদের দিনে ৭ শ্রেণীর লোক নিশ্চিন্তে নিরাপদে থাকবে। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ সাত শ্রেণীর লোককে সেদিন আল্লাহ তাঁর সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন। যে দিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়াই থাকবে নাঃ (১) ন্যায়পরায়ণ ইমাম বা শাসক ; (২) মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর ইবাদতে মশগুল যুবক ; (৩) মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি ; (৪) দু'জন লোক একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই বন্ধুত্বে আবদ্ধ হয় আবার আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই বিচ্ছিন্ন হয় ; (৫)এরূপ লোক, যাকে কোন রূপসী-সুন্দরী নারী ব্যভিচারের প্রতি আহ্বান করে ; কিন্তু সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি ; (৬) যে ব্যক্তি অত্যন্ত গোপনভাবে দান-খয়রাত করে, এমনকি তার ডান হাতে যা কিছু দান করে, তার বাম হাতও তা জানতে পারে না ; (৭) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার দু'চোখের অশ্রু ঝরতে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম।

পুণ্যবান লোকদের বিচার অতি সহজ হবে। অনেকের কোন হিসাব-নিকাশই হবেনা ; বিনা হিসাবে তারা বেহেশত পাবে। কিন্তু পাপীদের জন্য সেদিনটি হবে বড়ই অপমান আর আক্ষেপের দিন।

শেষ বিচারের দিন সকাল থেকে শুরু করে দুপুরের মধ্যেই সব মানুষের বিচার কার্য শেষ হবে। পাপী বান্দাদের কারো কারো কাছে দিনটি পঞ্চাশ বছর দীর্ঘ মনে হবে। আপনার আমার সবাইকে সেদিন এক করে আল্লাহর সামনে বিচারের জন্য হাজির হতে

হবে। কেউ বাদ থাকবে না। সাহায্য করার মত কেউ থাকবে না। একাকী নিজের জবাবদিহি নিজেকেই করতে হবে। কী ভংকর দৃশ্য। এক মিনিট চোখ বন্ধ করে দৃশ্যটি একবার কল্পনা করুন। এ ভয়ানক সময়টিতে আপনার কেমন লাগবে।

বিচারের পর পাপাচারীদের বাম হাতে এবং পুন্যবানদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। আমলনামায় সমস্ত জীবনের কর্মকাণ্ডের বর্ণনা, হিসাব-নিকাশ এবং বিচারের রায় লিখিত থাকবে। বলা হবে, "ইকরা কিতাবিকা"- আজ তোমার হিসাব তুমি নিজেই পড়।

সবাই আগে থেকেই তাদের আমলনামার অবস্থা বুঝতে পারবে। এজন্য পাপাচারীরা আমলনামা হাতে নিতে চাইবে না। তারা তাদের হাত পেছনে লুকাতে থাকবে। ফেরেশতাগণ পেছন থেকে তাদের হাতের মধ্যে আমলনামা গুঁজে দিবে। একজন ঘোষক তার নাম ঠিকানা উল্লেখ করে ঘোষণা করবে "অমুকের পুত্র অমুক বিফল হয়েছে, কোনদিন সে আর সফল হতে পারবে না।"

এক সময়ে আপনার নামটিও ঘোষণা করা হবে। তখন আপনার অবস্থা কেমন হবে!

অপরদিকে পুণ্যবান ব্যক্তিরা আমলনামা হাতে পাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকবে। তার ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। ঘোষক তার নাম ঠিকানা উল্লেখ করে ঘোষণা করবে, "অমুকের পুত্র অমুক সফল হয়েছে। কোনদিন সে আর বিফল হবে না। আমলনামা হাতে পেয়ে সে মহা উল্লাসে দৌঁড়াতে থাকবে। আপনজনদেরকে ডেকে বলবে, দেখ! দেখ! আমি সফলকাম হয়েছি। তার আনন্দের আর সীমা থাকবে না। কোনদিন সে আনন্দ শেষ হবে না। কোনদিন না।

এ দিকে পাপী বান্দারা আমলনামা হাতে পেয়ে মহা চিন্তায় পড়ে যাবে। আমলনামা পড়ে মনে মনে বলবে, "হায় আমার দুর্ভাগ্য! এ কেমন কিতাব, ছোট বড় কোন কিছুই এখানে বাদ যায়নি, যা আমি করেছি।" (সূরা কাহাফ, আয়াতঃ ৪৯)

মরিয়া হয়ে সে চেষ্টা করবে এই মহা বিপদ থেকে বাঁচার জন্য। অদূরেই সে দেখতে পাবে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা দোযখের লেলিহান অগ্নিশিখা। এ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সে মিথ্যার আশ্রয় নিবে। সমস্ত অপরাধ অস্বীকার করে সে বলবে, আমি এসব কিছুই করিনি। ফেরেশতারা আমার বিরুদ্ধে বেশি বেশি লিখে রেখেছে। তখন আল্লাহ তাআলা তার মুখ বন্ধ করে দিবেন। হাত পা তার কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, "এটা তো হবে কেবল এক মহা নাদ। সে মুহূর্তেই তাদের সবাইকে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে। আজকের দিনে কারো প্রতি জুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা করেছ কেবল তারই প্রতিদান পাবে। এ দিন

জান্নাতীরা আনন্দে মশগুল থাকবে। তারা এবং তাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবেশে আসনে হেলান দিয়ে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফল-মূল এবং যা চাইবে। করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'। হে অপরাধীরা ,আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও। হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের এবাদত করো না,সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু এবং আমার এবাদত কর। এটাই সরল পথ। শয়তান তোমাদের অনেক দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তবুও কি তোমরা বোঝনি ?

এই সে জাহান্নাম, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হতো। তোমাদের কুফরের কারণে আজ এতে প্রবেশ কর। আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।" (সূরা ইয়াসীন:৫৩–৬৫)

অপরাধীরা মরিয়া হয়ে সকল অপরাধের অভিযোগ অস্বীকার করবে। তারা বলবে, আমার এই ঘোরতর বিপদের দিনে আমারই হাত-পা, আমারই শরীরের অংগপ্রত্যঙ্গ অমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে, আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে। অতপর আল্লাহ তাআলা ভিডিওর মত তার জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ড তাদের সামনে তুলে ধরবেন। তখন আর বিশ্বাস না করে কোন উপায় থাকবে না।

তারপরও অপরাধীরা উপায় বের করতে চেষ্টা করবে-কিভাবে এই ভয়াবহ আগুন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করে নিবে এবং পুনরায় দুনিয়াতে পাঠানোর জন্য আল্লাহর কাছে অনুরোধ জানাবে। তারা বলবে "হায় যদি আমাদের একবার পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ হতো তাহলে আমরা ঈমানদারদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেতাম" (সূরা শুআরা, আয়াত:১০২)

"তারা(জাহান্নামে) চিৎকার করে বলবে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে মুক্তি দাও,আমরা সৎ কাজ করব। পূর্বে যা করতাম তা আর করব না। আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দেইনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে ? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং এখন শাস্তি ভোগ কর। জালেমদের কোন সাহায্যকারী নাই।"(সুরা ফাতির, আয়াতঃ ৩৭)

হাজার চেষ্টা করেও সে সুযোগ আর তখন ফিরে আসেবে না যা এখন আমাদের হাতে আছে। পাপীদের জাহান্নামে এবং পুণ্যবানদের জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। জান্নাতের আনন্দ উপভোগরত এক ব্যক্তির তার এক বন্ধুর কথা মনে পড়বে-যে দুনিয়াতে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল; কিন্তু সে ছিল পাপাচারী। বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের জন্য সে আল্লাহ তাআলার কাছে আবেদন করবে। আল্লাহ বেহেশতবাসীদের সব আবেদন,

সব আশা পূরণ করবেন। বেহেশতের মধ্যে থেকেই তাকে তার দোযখে অবস্থানরত বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হবে। অতপর তাদের মধ্যে যে কথোপকথন হবে তা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "তারা (বেহেশতবাসীরা) একে অপরের প্রতি মনোনিবেশ করে কথাবার্তা বলবে। একজন বলবে, পার্থিব জীবনে আমার এক সাথী ছিল। সে আমাকে বলতো, তুমি কি বিশ্বাস কর যে, আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হবে তখনও আমরা প্রতিফল প্রাপ্ত হব? আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি উঁকি দিয়ে দেখতে চাও? অতঃপর সে উঁকি দিয়ে দেখবে এবং জাহান্নামের মাঝখানে দেখতে পাবে। সে বলবে, আল্লাহর কসম তুমিতো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে। আমার রবের (প্রতিপালকের) অনুগ্রহ না হলে আমিও যে গ্রেফতারকৃতদের সাথেই উপস্থিত হতাম। এখন আমাদের আর মৃত্যু হবে না, আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং আমরা শাস্তিও পাব না। এটাই মহাসফল্য। (সূরা-সাফ্‌ফাত, আয়াতঃ ৫০-৬০)

আমদের প্রত্যেকেরই উপরোক্ত দুই অবস্থার যে কোন একটির সম্মুখীন অবশ্যই হতে হবে। আমাদের জীবনের আমল হিসাব করে দেখা দরকার যে, কোন পরিস্থিতি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

এ যুগের খুব কম মানুষই মৃত্যুর সময়ের সুখকর পরিস্থিতির আশা করতে পারে। অতএব ভয়ঙ্কর দিনের এবং ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার আগেই ঐ দিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করাই হবে প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ যেদিন হাজার চেষ্টা করেও কোন লাভ হবে না। কোন রকম সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। শুধু আক্ষেপ করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না।

## মানব জীবনে সবচে' বড় পাওয়া কি ?

শৈশব থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত মানুষের জীবনের প্রাণান্তকর চেষ্টা চলে প্রাপ্তি ও সাফল্য অর্জনের জন্য। কিন্তু মানব জীবনের সবচে' বড় পাওয়া, সবচে' বড় সাফল্য (Chief achievement) কী?

একজন ছাত্র পরীক্ষায় ভাল ফলাফল লাভ করার জন্য কত পরিশ্রম করে। একজন রাজনীতিবিদ এম.পি. বা মন্ত্রী হবার জন্য কী যে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে তা কারো অজানা নয়। আগের দিনে এক রাজা আর এক রাজাকে পরাজিত করে তার রাজ্য জয় করার জন্য কিংবা নিজের রাজ্য ও রাজত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য জানবাজি রেখে লড়াই করত; এমন কি প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হত না।

অন্যান্য সাফল্য অর্জনের কথা না হয় বাদই দিলাম, মন্ত্রীত্ব কিংবা রাজত্ব অর্জনই কি মানুষের সবচে' বড় অর্জন-যার জন্য মানুষের এত উদগ্র বাসনা, এত প্রচেষ্টা? মোটেই তা নয়। মানুষের জীবনের সবচে' বড় অর্জন হল আখেরাতের জীবনের সাফল্য অর্জন। যে অর্জনের কোন শেষ নেই, যে প্রাপ্তির কোন তুলনা নেই। আর দুনিয়ার জীবনের প্রাপ্তি যতই বড় হোক না কেন তা মাত্র কিছু দিনের জন্য। আখেরাতের তুলনায় তা নিতান্তই সামান্য। এ বিষয়টি আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

দুনিয়াতে আল্লাহ মানুষকে পাঠিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য। তিনি পরীক্ষা করে দেখতে চান কে তাকে মানে আর কে তাকে মানে না। আমরা আল্লাহর এই পরীক্ষায় যে ফেল করে যাচ্ছি তা কেউ ভ্রূক্ষেপ করি না। অথচ স্কুল কলেজের সামান্য একটা সার্টিফিকেট অর্জনের পরীক্ষার জন্য মানুষ কত বেশি পেরেশান থাকে। কত পরিশ্রম করে থাকে। অথচ আসল পরীক্ষা যেটা, যে পরীক্ষায় পাশ করলে লক্ষ কোটি গুণ বড় পুরস্কার সে পরীক্ষার ব্যাপারে আমরা নির্বিকার। এটা কি কোন বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে?

পরকালের জীবনের প্রতি যারা বিশ্বাসী নয় তাদের কথা না হয় বাদই দিলাম আমরা যারা বিশ্বাসী তারাই কি সঠিক কাজটি করছি? নাকি আমরা আমাদের বিশ্বাসের পরিপন্থি কাজই করে যাচ্ছি? শয়তান প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, যে মানুষের জন্য সে বেহেশত থেকে বিতাড়িত হয়ে জাহান্নামী হল সেই মানুষ জাতিকে অবশ্যই সে জাহান্নামে নিয়ে ছাড়বে। তাহলে কি আমরা শয়তানের কাছে হেরে যাব? যদি তাই হয় তাহলে এই হারা হবে চূড়ান্ত হারা যা কোন কালে, কোন ভাবেই শোধরানো যাবে না। থাকবে শুধু আপেক্ষ আর আপেক্ষ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, **"(কিয়ামতের দিন) বন্ধু বন্ধুর খবর নিবেনা, যদিও তারা একে অপরকে দেখতে পাবে। অপরাধীরা শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য বিনিময় স্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, তার স্ত্রী ও ভাইকে, তার জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে-যারা তাকে আশ্রয় দিত এবং পৃথিবীর সকলকে যাতে এই মুক্তিপণ তাকে মুক্তি দেয়। কিন্তু না, তার জন্য থাকবে লেলিহান অগ্নিশিখা যা তার গায়ের চামড়া খসাবে। জাহান্নাম তাদেরকে ডাকবে যারা মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল এবং যারা সম্পদ জমা ও সংরক্ষণ করে রেখেছিল।......আর যারা তাদের রবের শাস্তি সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত থাকত এবং নামাজে নিষ্ঠাবান ছিল তারাই সম্মানিত হবে জান্নাতে।" (সুরা মায়ারিজ, আয়াত ঃ ১০-৩৩)**

**আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, "যখন তাদেরকে অগ্নির পাশে দাঁড় করানো হবে, তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারতাম তবে**

**আমাদের রবের আয়াতকে অমান্য করতাম না এবং ঈমানদারদের অন্তর্ভূক্ত হতাম। (আল কুরআন ৬ : ২৭)**

**"হে মানব, তোমার রবকে (প্রভুকে) ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনের যেদিন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না, পুত্রও পিতার কোন কাজে আসবে না। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিক জীবন তোমাদেরকে যেন ধোঁকায় না ফেলে এবং সেই প্রবঞ্চক (শয়তান) যেন আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না করে"। (সুরা লুকমান, আয়াত ঃ ৩৩)**

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে সাবধান করছেন যেন আমরা শয়তানের ও পার্থিব জীবনের ধোঁকায় না পড়ি। কিন্তু আমরা প্রায় সবাই তো শয়তানের ধোঁকা ও প্রবঞ্চনায় পড়ে আছি। শয়তান প্রতিজ্ঞা করেছিল, যে মানুষের জন্য আমি জান্নাত থেকে বিতাড়িত হলাম, তাদেরকে আমি জাহান্নামে নিয়েই ছাড়ব। সুতরাং আমাদেরকে সাবধান হতে হবে সেই আক্ষেপের দিন আসার আগে-যেদিন সবাই আক্ষেপ করবে কিন্তু কিছুই করার থাকবে না। জাহান্নামীরা তো আক্ষেপ করবেই, জান্নাতীরাও আক্ষেপ করবে, দুনিয়াতে কেন আরও বেশি আমল করলাম না তাহলে এখানে আরও বেশি পুরস্কার পেতাম।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "তোমাদের কি এখনো সময় আসেনি আল্লাহর স্মরণে হৃদয়-মন বিগলিত করবার?" (সূরা হাদীদ ঃ ১৬)

## পরকালে হিসাব দেওয়ার পূর্বেই নিজের হিসাব নিজে করুন

আমাদেরকে হিসাব কষে দেখতে হবে জীবনের যতটা সময় পার করে দিয়েছি তাতে যে আমল করেছি সে আমল দিয়ে আমাদের স্থান কোথায় হবে -জান্নাতে না জাহান্নামে। যদি জাহান্নামে হয় তাহলে তা হবে বড়ই দুভার্গ্য। জাহান্নাম এমনি এক স্থান কোন চোখ তা দেখেনি, কোন মন তা কল্পনাও করতে পারেনি। এটা চিরস্থায়ী আযাবের স্থান যা থেকে পালাবার কোন পথ নাই।

আল্লাহ তাআলা বলেন, **"যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে আগুনের পোশাক; তাদের মাথার উপর ঢালা হবে ফুটন্ত পানি, যা তাদের পেটের মধ্যে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া গলিয়ে ফেলবে। আর তাদের জন্য থাকবে লোহার মুদগর। যখনই তারা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে তখনই তাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। বলা হবে, ভোগ কর দহন-যন্ত্রণা" (সুরা হাজ্জ, আয়াত ঃ ২০-২২)**

"তারা (জাহান্নামে) চিৎকার করে বলবে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে মুক্তি দাও, আমরা সৎ কাজ করব। পূর্বে যা করতাম তা আর করব না। আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দেইনি যে, তখন কেউ সর্তক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং এখন শাস্তি ভোগ কর। জালেমদের কোন সাহায্যকারী নাই।" (সুরা ফাতির, আয়াতঃ ৩৭)

জাহান্নামীরা বলবে, "হায়, যদি আমাদের একবার পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ হতো তাহলে আমরা ইমানদারদের অন্তরর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।" (সুরা শুআরা, আয়াতঃ ১০২)

অপর দিকে জান্নাতের বর্ণনায় আল্লাহ তাআলা বলেন, **সেখানে তারা সুসজ্জিত আসনে (হেলান দিয়ে) বসবে। তারা সেখানে বেশি ঠান্ডা বা গরম বোধ করবে না। ঘন-সন্নিবেশিত বৃক্ষ-ছায়া তাদের উপর থাকবে এবং এর ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্বে থাকবে। তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্যপাত্রে এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পাত্রে। ........তাদেরকে পরিবেশন করবে চির-কিশোরগণ, দেখে মনে হবে ওরা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা। তুমি যখন সেখানে দেখবে, দেখতে পাবে ভোগ বিলাসের উপকরণ ও বিশাল রাজ্য। তাদের আবরণ (পর্দা) হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম। তারা অলংকৃত হবে রূপার কাঁকনে। আর তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়। অবশ্য এটাই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টার স্বীকৃতি।" (সূরা দাহর, আয়াতঃ ১২-২২)**

এই চিরস্থায়ী সুখের আবাস পেতে হলে এবং অনন্ত আযাবের স্থান জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতেই হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, " যারা ঈমান এনেছে তাদের হৃদয় কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ভক্তি বিগলিত হবার সময় এখনো আসেনি?" (সুরা হাদীদ, আয়াতঃ ১৬)

তিনি আরও বলেন, "যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয় আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করি, যে হয় তার সহচর। শয়তানই মানুষকে সৎপথ থেকে বিরত রাখে অথচ মানুষ মনে করে যে সৎপথেই আছে। অবশেষে যেদিন সে আমার নিকট হাজির হবে সেদিন শয়তানকে বলবে, হায়! তোমার ও আমার মধ্যে যদি পূর্ব-পশ্চিমের ব্যবধান থাকতো। কত নিকৃষ্ট সহচর সে! আর আজ তোমাদের এই অনুতাপ কোন কাজে লাগবে না" (সুরা যুখরুফ, আয়াতঃ ৩৬-৩৯)

"অপরাধী জালেমরা নিজের হাত কামড়াতে থাকবে এবং বলবে, হায়! আমি যদি রাসূলের আদর্শ গ্রহণ করতাম। হায় আমার দুর্ভাগ্য! অমুক ব্যক্তিকে যদি আমি

বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। তার প্ররোচনায় পড়ে আমি সে ভাল নসীহত গ্রহণ করিনি যা আমার কাছে এসেছিল।" (সূরা ফুরকান, আয়াতঃ ২৭-২৯)

অনেকেই ছাত্র জীবনে, কর্মজীবনে বা বিবাহের ক্ষেত্রে কোন ভাল সুযোগ ছেড়ে দিয়ে বা কোন ভুল করে সারা জীবন আক্ষেপ করেন কিন্তু সে সুযোগ কখনও ফিরে আসে না। অথচ এ আক্ষেপ মাত্র কিছু দিনের জন্য, দুনিয়ার জীবনেই সীমাবদ্ধ, এর পর আর থাকবে না। কিন্তু আখেরাতের আক্ষেপ সে তো মহা আক্ষেপ, অনন্ত কালের আক্ষেপ। কোন কালেও এ আক্ষেপ শেষ হবে না।

সুতরাং আক্ষেপের দিন আসার আগেই আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে। বিগত জীবনে যা অন্যায় হয়েছে তা থেকে সত্যিকারভাবে তওবা করে পরিপূর্ণ মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে। আল্লাহর নবী মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) নিষ্পাপ ছিলেন। তবু তিনি প্রতিদিন সত্তুর বারেরও বেশি তওবা করতেন। আল্লাহ তাঁর নবীকে পাঠিয়েছেন কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে পরিশুদ্ধ করবার জন্য।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, **"তোমরা পুরোপুরি ইসলামে দাখিল হও।" তোমরা পরিপূর্ণ মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা ইমরান ঃ ১০২)**

## মুসলিম মানে আত্মসমর্পণকারী

পরিপূর্ণ মুসলিম হতে হলে আমাদেরকে আল্লাহর বিধানের কাছে পুরোপরি আত্মসমর্পণ করতে হবে। ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ করা। মুসলিম মানে আত্মসমর্পণকারী। নিজেদের পছন্দমত অথবা মানব রচিত সমস্ত পথ, মত, মতবাদ ও তরীকা থেকে ফিরে এসে একমাত্র রাসুল (সাঃ) এর পথ অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ ও অনুশীলন করতে হবে। এজন্য অন্যের কথায় আশ্বস্থ না হয়ে কুরআন ও হাদীস নিজে বুঝে পড়তে হবে এবং কোনটি সঠিক পথ তা সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকেই বুঝে নিতে হবে।

আগের দিনে শিক্ষিত মানুষ বেশি ছিল না। কুরআন হাদীসের বাংলা অনুবাদও বেশী পাওয়া যেত না। এজন্য পীরসাহেবদের মাধ্যমে মানুষ কুরআন হাদীসের চর্চা করার সুযোগ পেত। পীরসাহেবগণ তখন সত্যিকার শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতেন। সে সকল সত্যিকার হাক্কানী পীরসাহেবদের উত্তরসুরীরা এখন পীর-মুরীদীকে ইনকাম সোর্স বা ব্যবসা হিসেবে নিয়েছে। বাজারে যা ভাল চলে তার নকল হয় বেশি। এ কারণে অনেক নকল পীর বা ভণ্ড পীরের প্রকাশ পেয়েছে। এসব ভণ্ড পীরেরা শুধু টাকার জন্য নিজেদের এবং মানুষদের ঈমান নষ্ট করে দিচ্ছে। এদের প্ররোচনায় অনেকে মাজারে গিয়ে শিরকে লিপ্ত হচ্ছে। মনের আশা পুরণের জন্য

মাজারে যাওয়া, মোমবাতি দেওয়া বা পীরের কাছে ধরণা দেওয়া সম্পূর্ণ হারাম। যা চাওয়ার তা আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে। আর কারো কাছে নয়।

অনেকেরই ধারণা পীর ধরলে তারা শেষ বিচারের দিনে আল্লাহর কাছে মুরীদের জন্য সুপারিশ করে বেহেশতে নিয়ে যাবে। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। পীরসাহেবরা তো দূরের কথা, হাদীসে আছে, হাশরের মাঠে নবী-রাসূলরা পর্যন্ত নিজেদের চিন্তায় পেরেশান থাকবেন। হাশরের মাঠের অসহ্য কষ্ট সইতে না পেরে লোকেরা যখন একে একে আদম (আঃ), নূহ (আ), ইবরাহীম (আ) প্রমুখ নবীদের কাছে সুপারিশের জন্য যাবে তখন তাঁরা সবাই অপারাগতা প্রকাশ করে বলবেন, তোমরা শেষ নবী মুহাম্মাদের (সা:) কাছে যাও। একমাত্র তিনিই সুপারিশ করতে পারবেন। নবীদেরই যখন এই অবস্থা হবে তখন অন্যদের কি হবে তা সহযেই অনুমেয়।

## ৭২ ফেরকার মধ্যে একটি মাত্র দল সত্যপন্থী

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে ৭২টি দল (ফেরকা) হবে এর মধ্যে একটি মাত্র দল হবে সত্যপন্থী অন্য সবগুলো দল পথভ্রষ্ট। আর একমাত্র সঠিক পথ হল কুরআন ও সুন্নাহর পথ। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আমার রেখে যাওয়া দুটি জিনিস যদি তোমরা আঁকড়ে ধরে থাক তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলঃ আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের সুন্নাত।

তিনি আরও বলেছেন, “আমার উম্মাতের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত একটি সত্যপন্থী দল থাকবে। তারা কখনো সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হবে না।” এই সত্যপন্থীদের বৈশিষ্ট্য কী? তাদেরে চেনার বা বুঝার উপায় কী?

তাদের চেনার উপায় সম্পর্কে সাহাবীদের প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সত্যপন্থীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছিলেন। এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল; এরা সর্বদা কুরআন সুন্নাহর অনুসরণ করবে এবং সংখ্যায় এরা কুরআন সুন্নাহর অনুসরণের দাবীদার দলগুলোর মধ্যে সবচে’ ভারী হবে।

পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সত্যপন্থীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, “কুনতুম খাইরা উম্মাতিন উখরিযাত লিন্নাসি তা’মুরুনা বিল মা’রুফি ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার”। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে তোমরাই উত্তম জাতি, তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে বাধা দিবে। (সূরা ইমরান, আয়াতঃ ১১০)

কুরআনের অন্যান্য আয়াত থেকেও সত্যপন্থীদের চেনার সুযোগ রয়েছে। যেমন- আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "মানব জাতির মধ্যে ইহুদী ও মুশরিকরাই মুমিনদের প্রতি সবচে' বেশি বিদ্বেষ পোষণ করে। আর খ্রিস্টানগণ অপেক্ষাকৃত বন্ধু ভাবাপন্ন কারণ তাদের মধ্যে অনেক দুনিয়া বিরাগী লোক রয়েছে।" (সূরা মায়িদা, আয়াতঃ ৮২)

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য করলে এ আয়াতের সত্যতার বিস্ময়কর প্রতিফলন দেখা যায়। বিশ্বের ইহুদী অধ্যুষিত ইসরাঈল ও মুশরিক অধ্যুষিত ভারতে নিরবচ্ছিন্নভাবে মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা হয়। নির্যাতন-নিপীড়ন করা হয়। ধর্মীয় উগ্রবাদীরাই এসব করে থাকে। পক্ষান্তরে খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মগুরু ভ্যাটিকানের পোপ সব সময়ই বিশ্বের যে কোন স্থানে মুসলিম নির্যাতনের বিরোধিতা করে আসছে। ইহুদী ও মুশরিকরা সব ধরণের মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না। শুধুমাত্র যারা কুরআন সুন্নাহর সঠিক অনুসারী ও সত্যপন্থী তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে। অন্যান্য মুসলমানদেরকে বরং সাহায্যে সহযোগিতা ও সমর্থন করে থাকে।

যথাযথ কারণেই মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী একটি ফেরকার উৎপত্তি ও প্রধান ঘাঁটি (মারকাজ) উক্ত দুই রাষ্ট্রে–ভারতে ও ইসরাইলে। এই দুই স্থানে মুসলমানদের প্রতি সবচে' বেশি নির্যাতন চললেও এই মুসলমানদেরকে তারা সবচে' বেশি সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। অনুরূপভাবে ভারতের বিখ্যাত পীরসাহেবগণও ভারত সরকারের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে থাকে। এরা যদি সত্যিকার ইসলামের অনুসারী হতো তাহলে এদের উপরও অত্যাচারের স্টীমরোলার চলতো যেমনভাবে ইসলামের অনুসারী, আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনরত সত্যপন্থী ইসলামী দলগুলোর প্রতি বিদ্বেষ, শক্রতা ও নির্যাতন চলে আসছে।

এটাই চিরন্তন নিয়ম। যারা যত বেশি ইসলামের অনুসারী শয়তান তাদেরকে তত বেশি বাধা প্রদান করে। তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষাও তত কঠিন হয়। এটাই আল্লাহর বিধান।

হাদীস শরীফে আছে, মানুষের উপর পরীক্ষা ও বিপদ-আপদ আসে তার ঈমানের মান অনুসারে। এই হিসেবে নবী রাসূলদের উপর সবচে' বেশি বিপদ আপদ ও পরীক্ষা এসে থাকে। তারপর ঈমানের তারতম্য অনুসারে অন্যান্যদের উপর। সত্যপন্থীদের এটাও একটা বৈশিষ্ট্য যে, এরা কখনো বাধা বিঘ্ন থেকে মুক্ত থাকে না। কঠিন বাধা বিপত্তি ও বালামুসীবাত এদেরকে ঘিরে থাকে। হাদীস শরীফে আছে, "দুনিয়া মুমিনদের জন্য কারাগার, কাফেরদের জন্য স্বর্গ"। সত্যপন্থীদের আরেক

বৈশিষ্ট্য হল, এরা দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত থাকে। দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতের জীবনকে প্রাধান্য দেয়। তারা নিজেদের মাল ও জান আল্লাহর পথে ব্যয় করে।

"মুমিনদের জান ও মাল আল্লাহ তাআলা জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন।" (সূরা তওবা, আয়াতঃ ১১১)

কুরআন ও হাদীস থেকে ইসলামের সঠিক অনুসারীদের যে বৈশিষ্ট্যের কথা জানা যায় সংক্ষেপে তা হলঃ এরা সৎকাজের আদেশ দেয়, অসৎ কাজে বাধা প্রদান করে। এরা জান দিয়ে মাল দিয়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে এবং এরা ইসলামের শত্রুদের নিকট থেকে সবচে' বেশি বাধা-বিঘ্ন, বিরোধিতা ও বিদ্বেষের স্বীকার হয়।

## সত্যপন্থীদের সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা

বর্তমানে সাধারণ মানুষদের ধারণা হল, যারা যত বেশি নীরব নিরিবিলি, দুনিয়া বিরাগী, মানুষের সাতে-পাঁচে থাকে না, শুধু আল্লাহ-বিল্লাহ নিয়ে থাকে তারা তত বেশি আল্লাহওয়ালা লোক। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। আল্লাহর নবী মুহাম্মদুর রাসুলহুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের দিকে রক্ষ্য করলে আমরা কি দেখিতে পাই? তাদের মত আল্লাহওয়ালা লোক পৃথিবীতে কেউ ছিল না, কখনো হবেও না। অথচ নবী করীম (সাঃ) একদিকে যেমন ছিলেন মসজিদের ইমাম অপর দিকে যুদ্ধের ময়দানের প্রধান সেনাপতি। একদিকে দেশের প্রেসিডেন্ট অপরদিকে ছিলেন নিজ পরিবারে একজন সাধারণ সংসারী ব্যক্তি। একদিকে যেমন ছিলেন একজন মেহনতি মানুষ অপরদিকে ছিলেন শ্রেষ্ঠ ও সফল রাজনীতিবিদ। সকল ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সবার শ্রেষ্ঠ, সবার আদর্শ ।

কেবলমাত্র একজন রাজনীতিবিদ হিসেবেও যদি বিচার বিশ্লেষণ করি তাহলেও দেখতে পাই তাঁর মত সফল ও শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ পৃথিবীর ইতিহাসে আর কেউ নেই। পৃথিবী বিখ্যাত রাজনীতিক ছিলেন মহাত্মা গান্ধী, আবরাহাম লিংকন, নেতাজী সুভাষ বোস, মার্টিন লুথার কিং, লেলিন, শেখ মজিবুর রহমান প্রমুখ। কিন্তু এদের কেউ কি মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর মত পরিপূর্ণ ও সফল রাজনীতিবিদ ছিলেন যিনি একাধারে একটি মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাতা, সংগঠক, দলনেতা, যুদ্ধজয়ী, রাজ্যবিজয়ী ও রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে রাজনীতির সকল ক্ষেত্র সফলভাবে কানায় কানায় পূর্ণ করেছেন? অবশ্যই নয়।

ইসলাম যেমন আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা তেমনি ভাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা) মানুষের জন্য একমাত্র অনুকরণীয়-অনুসরণীয় আদর্শ।

রাসুলুল্লাহ (সা) ছাড়া আর কেউ অনুসরণ করার যোগ্য নয়। আর কারো আদর্শ অনুসরণ করা বৈধ নয় যা রাসুলুল্লাহ (সা) এর আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক।

একমাত্র রাসুলুল্লাহ (সা) ছাড়া আর কেউ মানুষের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হবে কি করে? রাসুলুল্লাহ (সা) ছাড়া এমন কেউ কি আছে যার জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ড নির্ভুলভাবে লিখিতভাবে সংরক্ষিত রয়েছে–যা সকল মানুষের জন্য পরিপূর্ণ ও উত্তম আদর্শ হতে পারে? না, কেউ নেই। অথবা আর এমন কোন মানুষ কি আছে যে জীবনে কোন অন্যায় করেনি, এমনকি জীবনে কোন মিথ্যা কথা পর্যন্ত বলেনি। সুতরাং যারা ভুলে ভরা কোন মানুষকে অনুসরণ করবে তারাই ভুল করবে।

রাসুলুল্লাহ (সা) ছিলেন আল্লাহর ওহী (ঐশী প্রত্যাদেশ) দ্বারা পরিচালিত। তাঁর জীবনে কোন ভুল ছিল না। সুতরাং যে কেউ তার অনুসরণ করলে সে ভুল করবে না।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আজকাল মানবতার কল্যাণের জন্য গৌতম বুদ্ধের আদর্শ বা বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের আদর্শ কিংবা অমুক নেতা তমুক নেতার আদর্শ অনুসরণের কথা বলা হয়। গৌতম বুদ্ধের কথাই বলি বিশ্বের একশ কোটিরও বেশি লোক তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে থাকে। কিন্তু কী আছে তাঁর আদর্শে। তিনি বলছেন, "অহিংসা পরম ধর্ম"। কিন্তু বাস্তবে তিনি কি কখনও তা করে দেখাতে পেরেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) রাজ্য জয় করেছেন, পরাজিতদের কে ক্ষমা করে দেখিয়ে দিয়েছেন ক্ষমা ও অহিংসা কাকে বলে। যে মক্কাবাসীরা তাঁকে তাঁর স্বদেশভূমি থেকে বহিষ্কার করেছিল পরবর্তীতে তিনি যখন মক্কা জয় করেন তখন তাদেরকে নিঃশর্ত ক্ষমা করে দিয়ে ক্ষমা ও অহিংসার যে দৃষ্টান্ত রেখেছেন পৃথিবীতে আর কেউ কি তা করতে পেরেছেন। মুখে বলা সহজ কিন্তু বাস্তবে করে দেখানো তত সহজ নয়।

যদি যিশু খ্রিস্টের আদর্শের কথা বলি, তিনি কি পরিপূর্ণ আদর্শ হতে পারেন ? তাঁর ৩৩ বছরের জীবনকালে তিনি বিবাহ করেননি। যেহেতু তাঁর স্ত্রী বা সন্তান ছিল না ; তাহলে কি করে তিনি স্বামী বা পিতার আদর্শ হতে পারেন? কি করে তিনি একজন সেনাপতি অথবা একজন রাষ্ট্রপতির আদর্শ হতে পারেন–যখন তিনি তা ছিলেন না।

মানব ইতিহাসের সবচেয়ে স্মরণীয় ও প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিদের এক এক জন এক এক দিকে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করেছেন। প্রত্যেকের জীবনে একটি আদর্শের প্রতিফলন দেখা যায়। কেউ ছিলেন দয়ার সাগর, কেউ আমিত তেজ সাহসী বীর, কেউ বা রজনীতিবিদ, আর কেউ চিন্তাবিদ, কেউ সরলতার প্রতীক, আবার কেউ বা শ্রেষ্ঠ বিনয়ী। মনীষী সক্রেটিস, এরিস্টটল প্রমুখ ছিলেন আদর্শ দার্শনিক । মহামতি আলেক জাণ্ডার, নেপোলিযান এঁরা ছিলেন আদর্শ বীর। এ যুগে এসে পাই মাও সেতুং, মোহন লাল করমচাঁদ গান্ধীকে, আরো পাই লেলিন , স্ট্যালিন, মার্কস এমনকি বার্ট্রান্ড রাসেল, বার্নাড শ সবাই যে যার ক্ষেত্রে প্রতিভার স্ফূরণ ঘটিয়েছেন। কিন্তু মহানবী

হযরত মুহাম্মাদ (সা:) -এর চরিত্র এ সকল গুণের একত্রে সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি মানবীয় সকল বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন। সমগ্র মানুষের (Mankind as a whole) সম্পূর্ণ মনুষত্যের বিকাশ সাধনই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য । তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন রশ্মিরাজি চারদিকে বিকশিত হয়েছিল।

মহানবী (সা:) ছিলেন আদর্শ মানব। জীবনের সকল সময়ে সকল মানুয়ের জন্য তিনি সকল অবস্থায় আদর্শ হতে পারেন। অনাথ-ইয়াতীমদের আদর্শ আবদুল্লাহর পুত্র মুহম্মদ (সাঃ) -এর শৈশব মাতৃস্নেহ বঞ্চিত শিশুর আদর্শ, তায়েফের ভাগ্যবতী ধাত্রী হালিমা সাদিয়ার ঘরে বালক মুস্তাফা। ধনীদের আদর্শ সফল ব্যবসায়ী আর বয়ঃকালে বাহরাইনের মালিক বাদশাহ মুহাম্মাদ (সা:) -এর জীবন; সর্বহারা নির্যাতিতের আদর্শ আবু তালিবের গিরি গুহায় নির্বাসিত দীর্ঘদিনের জন্য বন্দী মুহাম্মদ (সা:) । বিজয়ী বীরের আদর্শ বদর আর হুনায়নের সেনাপতি মুহাম্মাদ (সা:) বিজিতদের আদর্শ ওহুদের যুদ্ধে আহত মুহম্মদ (সা:) ।

শিক্ষকের আদর্শ মদীনার মসজিদ আর আহলে সুফ্ফার শিক্ষকের বরণীয় জীবন। ছাত্রের আদর্শ হেরা গুহায় জিবরাঈলের নিকট শিক্ষার্থী সাধক; আদর্শ বাগ্মীর আদর্শ দশ বছর মদীনার মসজিদে খুৎবা দান ও আরাফাত ময়দানে বিদায় হজ্জের ভাষণ দানরত মুহাম্মাদ (সা:) । আল্লাহর পথে সহায় সম্বলহীন সংগ্রাম ও সাধনারত মাহমানবের আদর্শ মক্কায় তেরো বছরের নবীজীবন। পরাজিত দুশমনের প্রতি বিজয়ী বীরের আদর্শ মক্কা বিজয়ী মুহাম্মদ (সা:) ।

আদর্শ সাংসারিক মহামানব খায়বার, ফিদাক, বনি নাজার গোত্রের ভূসম্পত্তির মালিক মুহাম্মদ (সা:) । আরব মরুর মেষ চালক সংযত চরিত্র আহমাদ আল আমীনের বরণীয় জীবনী সারা বিশ্বের যুব সমাজের আদর্শ। ব্যবসায় পণ্য কাঁধে কুরায়েশ কাফেলার সাথী, সিরিয়াগামী সওদাগর মুহাম্মদ (সা;) কর্মী ব্যবসায়ী ও তরুণ সমাজের সম্মুখে আদর্শের আলোক স্তম্ভ।

মহানবী (সা:) এর চরিত্রের আরো একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেক মহাপুরুষের কর্ম জীবন সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। আর মহানবী (সা:) এর কর্ম মানবজীবনের সর্ব ক্ষেত্রে প্রসারিত। সাম্রাজ্য জয় এবং পাপ ও কুসংস্কার থেকে রক্ষা করা যদি মহাপুরুষের লক্ষণ হয়, তবে হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর জুড়ি এ পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যাবেনা।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। সুতরাং সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর আদর্শের চেয়ে উত্তম আদর্শ আর হতে পারে না। তাঁর আদর্শ বাদ দিয়ে যারা আমুকের আদর্শ

তমুকের আদর্শ বা অন্য জাতির আদর্শ ও রীতি-নীতি অনুসরণ করতে চায় তার চেয়ে বোকা ও হতভাগা আর কেউ হতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ (সা:) ছিলেন এমন একজন অনন্য সাধারণ মহাপুরুষ যাঁর পবিত্র শরীর মোবারকে কখনো দুর্গন্ধ হতো না, সর্বদা সুরভিত থাকতো । কেউ তাঁর (সা:) পবিত্র হাতের সাথে হাত মেলালে (করমর্দন করলে) সারা দিন তার হাত সুবাসিত তাকতো। সাসূলুল্লাহ (সা:) এর গায়ের ঘাম মোবারক ছিল মুক্তোর দানার মত উজ্জ্বল ও সুভ্র সুরভিত। অনেক সাহাবী তাঁর গায়ের ঘাম সংগ্রহ করে রাখতেন এবং সুগন্ধি (perfume) হিসেবে ব্যবহার করতেন। তাঁর পায়খানা প্রস্রাবেও দুর্গন্ধ থাকতো না এবং মাটিতে পড়লে মাটি তা গ্রাস করে নিত।

প্রখর রোদে পথ চলতে থাকলে মেঘেরা এসে তাঁকে ছায়া দিয়ে চলতো। কখনো ফেরেশতা এসে ছায়া দিত। গাছের শাখা নুইয়ে এসে তাঁকে অভিবাদন জানাতো। যে পথ দিয়ে তিনি চলে যেতেন সে পথ দিয়ে অন্য লোকেরা চলতে গিয়ে বুঝতে পারতো যে, এ পথ দিয়ে নবীজী (সা:) চলে গেছেন। সে পথের বাতাস স্নিগ্ধ সুরভিতে ভরে যেত। নবীজীর (সা:) শরীর মোবারকে কখনো মশামাছি বসতো না।

সুতরাং মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন পরিপূর্ণ জীবন বিধান তথা ইসলামের সর্বশেষ প্রতিষ্ঠাতা। ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান (Complete Code of Life)। "ইন্নাদ্দীনা ইংদাল্লাহিল ইসলাম"। ইসলাম ছাড়া আর কোন পরিপূর্ণ জীবন বিধান নাই যাকে অনুসরণ করা যায়। অতএব কেউ যদি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিশ্বব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলামের অনুসরণ না করে অথবা ইসলামের সাথে অন্যান্য বিধান বা মতাদর্শও (ism) মেনে চলে, এমন কি গ্রহণযোগ্য বলেও মনে করে, তাহলে তা হবে পরিষ্কার শিরক। শিরক অর্থ অংশীদারিত্ব। আল্লাহর বিধানের সাথে আর কারো অংশীদারিত্ব। শিরক হল কবীরা গুনাহ অর্থাৎ সবচে' বড় গুনাহ। আল্লাহ তায়ালা সব গুনাহ মাফ করেন কিন্তু শিরকের গুনাহ মাফ করেন না বলে হাদীসে বর্ণিত আছে। কাজেই বিষয়টি মুসলমানদের জন্য সবচে' গুরুত্বপূর্ণ। আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে যেন ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, গোপনে বা প্রকাশ্যে শিরকের মধ্যে জড়িয়ে না পড়ি।

এজন্য আসুন আমরা আংশিক মুসলমান না হয়ে পরিপূর্ণ মুসলিম হয়ে যাই। ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করি। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "হে মুমিনগণ, তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর।" (সূরা বাকারা, আয়াতঃ ১০৮)

যারা ইসলামের আংশিক অনুসরণ করে যা-বর্তমানে বেশিরভাগ মুসলমানের মধ্যে দেখা যায়, তাদের জন্য বড়ই দুর্ভাগ্য।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "তোমরা কি ইসলামের (কুরআনের) কিছু মানবে আর কিছু মানবে না? যারাই এমন করবে তাদের জন্য দুনিয়াতেও রয়েছে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আর আখেরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি। (সূরা বাকারা, আয়াতঃ ৮৫)। এই আয়াতের বাস্তব প্রতিফলন আজকের দুনিয়ায় দেখা যাচ্ছে। ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণ না করার কারণে বিশ্বব্যাপী মুসলমানগণ লাঞ্ছিত, অপমানিত, নির্যাতিত হচ্ছে।

সুতরাং দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতের মুক্তির জন্য আমাদেরকে অবশ্যই ইসলামের পূর্ণ অনুসরণ করতে হবে। ইতিহাস সাক্ষী, যতদিন মুসলমানগণ ইসলামের পূর্ণ অনুসারী ছিল, কুরআন হাদীসকে আঁকড়ে ধরে ছিল ততদিন (প্রায় ৮০০ বছর) তারা বিশ্বে সম্মানের ও বিজয়ীর আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। আর যখন থেকে মুসলমানরা ইসলামের অনুসরণ করা ছেড়ে দিয়েছে তখন থেকে হয়েছে পরাজিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত।

হৃত গৌরব ফিরে পেতে হলে, বিশ্বে বিজয়ীর আসন আবার ফিরে পেতে হলে এবং বিশ্বব্যাপি অমুসলিমদের নির্যাতন থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে হলে মুসলমানদেরকে ইসলামের পূর্ণ অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

## মুসলমানগণ আবার বিশ্ববিজয়ী হবে

হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে মুসলমানগণ আবার বিশ্বে বিজয়ী হবে যেমনভাবে তারা পূর্বে বিজয়ী হয়েছিল। তবে শর্ত হল মুমিন হওয়া, ইসলামের অনুসরণ করা। আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন, "তোমরা নিরাশ হয়ো না, হতাশ হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও।" (সূরা ইমরান, আয়াত-১৩৯)

অতএব আমাদেরকে মুমিন হতে হবে অর্থাৎ ইসলামের অনুসরণ করতে হবে মানবতার মুক্তি, সর্বোপরি নিজেরই মুক্তি ও কল্যাণের জন্য। আজ বিশ্বব্যাপী মানবতা বিপন্ন। শয়তানী অপশক্তির করাল থাবায় দেশে দেশে রক্ত ঝরছে লক্ষ লক্ষ বনী আদমের। মান সম্মান ভুলণ্ঠিত হচ্ছে। প্রাণ দিচ্ছে নারী, শিশুসহ হাজার হাজার নিরাপরাধ মানুষ। এসব অসহায় মানুষকে রক্ষার জন্য মুসলিম দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা যেমন অপরিহার্য তেমনিভাবে প্রত্যেক মুসলমানের নিজ নিজ দায়িত্ব রয়েছে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানোর। নইলে সবাইকে এর জন্য দায়ী হতে হবে। আল্লাহর কাছে কেউ রেহাই পাবে না। শেষ বিচারের দিন আমার, আপনার প্রত্যেকের আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে একাকী জাবাবদিহি করতে হবে। কেউ তখন সাথে থাকবে না, কোন দিক থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "সেই দিনের ভয় কর যখন কেউ কারো সামান্য উপকারে আসবে না এবং তার জন্য সুপারিশ কবুল করা হবে না, কারো কাছ থেকে

কোন ক্ষতিপূরণও গ্রহণযোগ্য হবে না এবং কোন রকম সাহায্যও পাবে না"। (সুরা বাকারা, আয়াত-৪৮)

"অপরাধী জালেমরা নিজের হাত কামড়াতে থাকবে এবং বলবে, হায়! আমি যদি রাসূলের আদর্শ গ্রহণ করতাম। হায় আমার দুর্ভাগ্য! অমুক ব্যক্তিকে যদি আমি বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। তার প্ররোচনায় পড়েই আমি সে ভাল নসীহত গ্রহণ করি নি যা আমার কাছে এসেছিল"। (সুরা ফুরকান, আয়াতঃ ২৭-২৯)

"তারা বলবে, হায়! আমরা যদি শুনতাম ও অনুধাবন করতাম তাহলে আজ এই দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনের উপযুক্ত লোকদের মাঝে গণ্য হতাম না।" (সূরা মূলক, আয়াত-১০)

'সেদিন তোমাদের জন্য কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের দুরাবস্থা পরিবর্তনের জন্য কোন চেষ্টাকারীও থাকবে না।" (সূরা আশশুরা, আয়াতঃ ৪৭)

"যখন আমলনামা সামনে রাখা হবে তখন দেখবে, অপরাধীরা ভীত আতংকগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। আর বলছে, হায়রে আমাদের দুর্ভাগ্য! এটা কেমন বই, আমাদের ছোট বড় কোন কাজই এখানে লেখা বাদ যায়নি। তারা যে যা কিছু করেছে সবকিছুই নিজের সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে"। (সূরা কাহাফ, আয়াতঃ ৪৯)

"তাদের কান, তাদের চোখ এবং দেহের চামড়া তারা পৃথিবীতে কি করতো সে সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। তারা তাদের শরীরের চামড়া সমূহকে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষ্য দিলে? তারা জবাব দিবে, সেই আল্লাহই আমাদেরকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন যিনি সবাইকে বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। আর এখন তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।" (সূরা হামীম সাজ্‌দাহ, আয়াতঃ ২০-২১)

শেষ বিচারের দিনের ভয়াবহ অবস্থা থেকে বাঁচতে হলে আমাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ নিষেধ পুরোপরি মেনে চলতে হবে, আংশিক নয়। পুরোপুরি ইসলামে দাখিল হতে হবে।

ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কাছে কোন কাজটি সবচেয়ে প্রিয়? জবাব দিলেনঃ যথা সময়ে নামায পড়া। জিজ্ঞেস করলাম তারপর কোনটি? জবাব দিলেনঃ পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনটি? জবাব দিলেনঃ আল্লাহর পথে জিহাদ করা। (ইমাম বুখারী ও মুসলিম)

আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা বেশি গুরুত্ব পূর্ণ কাজের জন্য বারবার তাকিদ দিয়েছেন। এজন্য কুরআনে নামাজ কায়ম করার কথা এসেছে ৮২ বার, রোজার কথাও

কয়েকবার এসেছে। কিন্তু সর্বাধিক বার যে কথাটি এসেছে তা হল, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ–আল্লাহর পথে জিহাদ করা। অতএব আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও ফরয কাজগুলি অবশ্যই পালন করতে হবে এবং হারাম কাজগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে।

## সংগঠন ছাড়া ইসলাম হয় না

রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে ৫টি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহ পাক আমাকে ঐগুলোর নির্দেশ দিয়েছেনঃ (১) জামায়াতবদ্ধভাবে থাকবে। (২) নেতার আদেশ মন দিয়ে শ্রবণ করবে (৩) তার আদেশ মেনে চলবে (৪) আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ বর্জন করবে (৫) আর আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। যে ব্যক্তি ইসলামী সংগঠন ত্যাগ করে এক বিঘত দূরে সরে গেল, সে নিজের গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল, তবে সে যদি সংগঠনে প্রত্যাবর্তন করে তো স্বতন্ত্র কথা। আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের রীতি-নীতির দিকে (মানুষকে) ডাকে সে জাহান্নামী, যদিও সে রোজা রাখে, নামাজ পড়ে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে। (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী)

আরেক হাদীস হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে একথা বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি (ইসলামী সংগঠনের) আমীরের আনুগত্য অস্বীকার করে জামায়াত পরিত্যাগ করল এবং সেই অবস্থাই মারা গেল, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল। (মুসলিম)

অপর এক হাদীস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আমার উম্মাতকে অথবা মুহাম্মদ (সা) তার উম্মতকে কখনও ভুল সিদ্ধান্তের উপর সংঘবদ্ধ করবেন না। আর জামায়াতের উপরই আল্লাহ তাআলার রহমত। সুতরাং যে ব্যক্তি জামায়াত (ইসলামী সংগঠন) থেকে বিচ্ছিন্ন হবে সে জাহান্নামে পতিত হবে। (তিরমিযী)

রাসুলুল্লাহ (সা) আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে আনন্দ উপভোগ করতে চায় সে যেন জামায়াতকে (ইসলামী সংগঠনকে) আঁকড়ে ধরে। কেননা শয়তান বিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তির সাথে থাকে এবং সংঘবদ্ধ দুই ব্যক্তি থেকে সে বহুদূরে অবস্থান করে।

তিনি আরও বলেছেন, "জামায়াতের (ইসলামি সংগঠন) প্রতি আল্লাহর রহমতের হাত প্রসারিত থাকে। যে ব্যক্তি জামায়াত ছাড়া একা চলে, সে তো একাকী দোযখের পথেই ধাবিত হয়"। (তিরমিযী)

হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মেষপালের শত্রু বাঘের ন্যায় মানুষের বাঘ হল শয়তান। বাঘ সেই মেষটিকেই ধরে নিয়ে যায় যে একাকী বিচরণ করে কিংবা পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে যায়। সাবধান! তোমরা দল ছেড়ে দুর্গম গিরিপথে যাবে না এবং তোমরা অবশ্যই জামায়াতবদ্ধভাবে সাধারণের সাথে থাকবে (আহমাদ)

হযরত উমার (রা) বলেছেন, "সংগঠন ছাড়া ইসলাম নেই, নেতৃত্ব ছাড়া সংগঠন নেই। আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব নেই"।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "সেই ব্যক্তির কথা অপেক্ষা আর কার কথা উত্তম হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে এবং বলে আমি মুসলমানদের অন্তরভুক্ত "(সুরা হা-মীম সাজদা, আয়াত: ৩৩)

"হে নবী! তোমার রবের পথের দিকে দাওয়াত দাও হিকমত ও নসীহতের সাহায্যে। আর লোকদের সাথে বিতর্ক কর উত্তম পন্থায়। তোমার রবই ভাল জানেন কে তাঁর পথ হতে ভ্রষ্ট হয়েছে আর কে সঠিক পথে আছে"। (সূরা নাহল, আয়াত-১২৫)

## আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য

কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত আলোচনা থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায় সংক্ষেপে তা হল–

ক) কুরআন-হাদীসের আলোকে জীবনকে ঢেলে সাজাতে হবে।

খ) অতীত যে সব ভুল-ক্রুটি হয়ে গেছে তা সংশোধন করে জীবনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে।

গ) মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর (সা) পরিপূর্ণ অনুসরণ করে জীবনকে পরিচালনা করতে হবে। পরকালীন মুক্তি ও কল্যাণের জন্য তো বটেই, এছাড়া দুনিয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে যে সব অফুরন্ত নিয়ামত দান করেছেন যেমন, দৃষ্টিশক্তি, বাকশক্তি, মেধা, বুদ্ধি যোগ্যতা কিংবা খাদ্য-পানি, আলো, শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বাতাস ইত্যাদি নিয়ামতের ট্যাক্স বা মূল্য পরিশোধের জন্যও আমাদের উচিত আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করা, ইবাদত করা। না করে কোন উপায় আছে কী? কারণ আমাদের সবাইকে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে।

ঘ) জামায়াতবদ্ধভাবে জীবন-যাপন করতে হবে।

৬) কুরআন হাদীস নিয়মিত বুঝে পড়তে হবে ও আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে এবং মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতে হবে। আল্লাহ বলেছেন, তুমি নিজে দোযখের আগুন থেকে বাঁচ এবং তোমার পরিবারকে বাঁচাও। (সূরা তাহরীম,আয়াত:৬)

তবেই আমরা আল্লাহর কাছে মুক্তি ও কল্যাণের আশা করতে পারব। আল্লাহ যেন আমাদেরক সঠিক পথ বুঝার ও সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করেন। আমীন।

***